দ্বিতীয় অধ্যায়

এক

কোনো লেখককে তাঁর যুগের মধ্যে প্রতিস্থাপন করে দেখা যেমন একটা বিশিষ্ট রীতি তেমনি তাঁর জীবনতথ্যের ভিতর থেকে সাহিত্যের সূত্র সন্ধান করার রীতিও প্রচলিত আছে। যে কোনো লেখকই যে তাঁর সময় এবং ব্যক্তিগত প্রতিভার একটা যোগসূত্রে সৃজনশীল হয়ে ওঠেন একথা স্বীকৃত। ফলে যেমন লেখকের যুগজীবনগত বৈশিষ্ট্য দেখতে হয় তেমনি তাঁর জীবনীর ভিতরেও সৃষ্টি বীজের সন্ধান করতে হয়। যাঁরা শুধুমাত্র যুগধর্মের প্রেক্ষিতে সাহিত্যসৃষ্টির বিশ্লেষণ করবার কথা ভেবেছিলেন নানা প্রশ্নে তাঁদের সেই বিশ্লেষণ ভেঙে পড়ে। বিশেষ করে একই যুগে কেন দুজন লেখকের সৃজনশীলতা দুরকম পথ নেয় তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিশ্লেষকেরা জীবনী আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাঁরা বললেন নিশ্চয় লেখকের এমন কোনো আন্তরবৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে তাঁদের রচনা আলাদা হয়ে যায়। এই কারণে কবি সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতার সন্ধান করা এবং সাহিত্যে তার প্রতিফলন খোঁজার শুরু হয়।

> "Thus rose biographical criticism which probes into the life of the poet to search for an explanation of his genius and of the distinctive qualities of his poetic achievement and even for its correct meaning." [১]

লেখকের জীবনীকে এই কারণে প্রয়োজনীয় মনে করা হল যে তার দ্বারা তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম বোঝা যাবে এবং তার প্রকৃত তাৎপর্যও আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

> "That biography explains and illuminates the actual product of poetry." [২]

এই জীবনীর ব্যবহার করার ফলে যেমন অনেক সময় সাহিত্যের অনেক প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয় তেমনি কখনো কখনো আবার সে রকম প্রত্যক্ষভাবে জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় না। একশ্রেণীর লেখক সাহিত্যের মধ্যে তাদের Personality র বিস্তার ঘটান "aims at displaying personality" [৩] আবার আর একশ্রেণীর লেখকের রচনায় দেখা যায় "obliteration of his concrete personality" [৪] সুতরাং জীবনীর তথ্য যে সব সময় রচনার অর্থ বুঝতে সহায়তা করবে তা নাও হতে পারে। তাছাড়া যেখানে লেখকের জীবনীর তথ্য আর রচনার প্রসঙ্গ মিলে যাচ্ছে সেখানেও জীবনীর তথ্য আর রচনা ঠিক এক নয়। জীবন থেকে তথ্য মাত্র সংগ্রহ করা হলেও সাহিত্যে তা অন্য এক মাত্রায় রূপ পেয়েছে। এই জীবনীসঞ্জাত সংবাদগুলি এমনভাবে সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে যে সেখানে তা সব ব্যক্তিগত অর্থ ও তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। সবসময় যে সাহিত্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ এটা ভাবা ভুল। বহু সময়ই যে ব্যক্তি সাহিত্য রচনা করে আর যে ব্যক্তি মানুষের অন্তরসত্তা এই সাহিত্যকার তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন এই দুই মানুষ সম্পূর্ণ পৃথক।

রবীন্দ্রনাথও কবিকে জীবনচরিতের মধ্যে না দেখতে বলেছেন। 'কবিকে পাবে না কবির জীবনচরিতে' [৫] ফলত এ এক দ্বিমুখী সমস্যা। একদিকে জীবনের তথ্য দিয়ে সাহিত্যের সৃজনমূল্য ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা আবার অন্য দিকে ব্যক্তির সৃষ্টিতে ব্যক্তির জীবনের চিহ্নকে মুছে ফেলা - এই দুয়ের এক বৈপরীত্য রচনার মধ্যে চলতেই থাকে। যারা expression of personality বলে সাহিত্যকে দেখেছিলেন তাদের পক্ষেও সবসময় লেখকের Personality খুঁজে দেখা মুসকিল হচ্ছিল। পূর্বোক্ত গ্রন্থকার বলেছেন

'কোনো লেখকের রচনায় তাঁর জীবনের বিপরীত দিক তাঁর স্বপ্ন কল্পনা বা এমন এক চিন্তা ফুটে উঠতে পারে যা লেখকের জীবনে ঘটেনি। তিনি রচনার মধ্যে যেমন স্বপ্নকে প্রতিফলিত করতে পারেন তেমনি আত্মপ্রকাশে কুন্ঠিত হয়ে রচনার মধ্যে নিজের জীবনকে গোপন করতে পারেন'[৬]। সুতরাং জীবন এবং সাহিত্যের মধ্যে ঠিক সরলরৈখিক কোনো সম্বন্ধসূত্র আবিস্কার করা যায় না।

সুবোধ ঘোষের সাহিত্য আলোচনার পক্ষে তাঁর জীবনতথ্য জানবার জন্য এটুকু ভূমিকা মাত্র। তিনি নিজেই বলেছেন —

> নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আকস্মিক প্রকারে সম্ভব হতে পারে কিন্তু নির্ঝর স্বয়ং একটি আকস্মিক সৃষ্টি নয়। তার ইতিহাস আছে। খুব সরল করে বলা চলে সেটা অভিজ্ঞতারই ইতিহাস।[৭]

সুতরাং একথা তো স্পষ্টই ভাবা যায় যে যিনি জীবনে প্রথম গল্প লিখেই বিখ্যাত হয়েছিলেন যাঁর সম্বন্ধে সমালোচকরা অকুন্ঠভাবে প্রশংসা বর্ষণ করেছেন তাঁর নিজের জীবনেও ছিল একটি প্রস্তুতির ইতিহাস। আর সে প্রস্তুতি কম চমৎকার নয়। হয়তো গভীর সেই অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির ইতিহাস বেয়েই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল আকস্মিক ভাবে। আর তাঁর প্রথম গল্প রচনার সঙ্গে তো জড়িয়ে আছে সেই আকস্মিকতারই বৃত্তান্ত। তিনি নিজেই বলেছেন জীবনের প্রথম গল্পটি লেখার আগে কোনদিন লেখক হবার তাগিদ তিনি অনুভব করেননি। হঠাৎ দরকার হয়েছিল বলেই প্রথম গল্পটি লিখেছিলেন। 'সেদিনের আলোছায়া' নামক আত্মস্মৃতিমূলক রচনায় তিনি একথা বলেছেন। 'ঘটনাটি বস্তুত আকস্মিক, কোনো অনুশীলিত প্রয়াসের পরিণাম নয়।'[৮] আজ আমরা জানি কিভাবে অনামী সংঘের চাপে পড়ে তিনি প্রথম অধ্যবসায়েই তাঁর জীবনের প্রথম গল্পটি রচনা করে নিয়েছিলেন এবং তা সেদিন কতোটা সাফল্যের সরব অভিনন্দনে অভিসিঞ্চিত হয়েছিল। প্রথম রচনাটি বার্ষিক আনন্দবাজারে প্রকাশ করতে পারার গৌরবও কিছু কম ছিল না। সুতরাং বলা যায় সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ যতই অনিশ্চিত হোক, তার পিছনে নিশ্চয় কোনো না কোনভাবে প্রস্তুতি একটা ছিলই। তিনিও তা অস্বীকার করেননি।

দুই

সুবোধ ঘোষের জন্ম ১৯০৯ সালে হাজারিবাগে। তাঁদের পূর্বনিবাস ছিল বাংলাদেশের বিক্রমপুর জেলার বহর গ্রাম। সুবোধের পিতা সতীশচন্দ্র ছিলেন হাজারিবাগের জেলখানার একজন স্বল্পবেতনের কর্মচারী। সুবোধ ছিলেন সতীশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র। তাঁর দাদা সুধীর ঘোষ ছিলেন ডাক বিভাগের একজন কর্মী। যে বছর সুবোধ ম্যাট্রিক পাশ করলেন সে বছরই তাঁর পিতা অবসর গ্রহণ করেন। ফলে সুধীরের সামান্য বেতনে গোটা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। কাজেই সংসারের অভাব মোচনের জন্য সুবোধের ওপরে তাঁদের ভরসা করতে হয়েছিল। সতীশচন্দ্রের অবসর গ্রহণের পর পরিবারের দারিদ্র্য বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। সুবোধকে তাই কলেজে পড়াশোনা ছেড়ে উপার্জনের পথে নামতে হয়। সুবোধচন্দ্র বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এরপর একের পর এক বহু জীবিকার পথে তিনি পা বাড়িয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনীতির সেই হতাশার কালে কিন্তু সামান্য কোনো একটি চাকরি যোগাড় করাও দুরূহ ছিল।

সেটা তখন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঁচ দেশে প্রত্যক্ষভাবে

সবার দ্বারা অনুভূত না হলেও এই বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বাঙালীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তনের আভাস বহন করে আনে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দেশ বিভাজন পর্যন্ত (১৯৩৯-১৯৪৭ ইং) সময়সীমায় ঘটে যায় বহু দ্রুত পরিবর্তন। প্রকৃতপক্ষে হঠাৎ এক ভূমিকম্পের মতই এই সময়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মানুষের মূল্যবোধ। অধিকাংশ মানুষ আদর্শভ্রষ্ট হয়ে যে কোন মূল্যে অধিকতর সুখ এবং সম্পদ করায়ত্ত করার তাগিদে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই গন্ডীবদ্ধ বাঙালীর কাছে প্রথম ধরা পড়ে বহির্বিশ্বের ভোগসর্বস্ব মোহময় রূপ। পশ্চিম দুনিয়ার প্রাচুর্যের চটকে, সম্পদলোভী দুনিয়ার দুর্নিবার আকর্ষণে, সাদা-মাটা বাঙালীর জীবন শিকড়ে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তখন নতুনত্বের চমক। সমাজ-জীবনে যৌথ পরিবারের আদর্শ সঙ্কটের মুখোমুখি, আর্থিক ক্ষেত্রে এক অসম প্রতিযোগিতা। এক আত্মকেন্দ্রিক, ভোগসর্বস্ব মানুষের মিছিল যেন মুহূর্তেই ম্লান করে দেয় একটি জাতির সযত্নলালিত ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে।

কেবলমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, নব্য আধুনিকতার এই উন্মাদনা ধরা পড়ে সমকালীন সাহিত্যেও। যা কিছু পুরোন তাকে ত্যাগ করে যাহোক কিছু নতুন সৃষ্টির প্রচেষ্টায় এক ঝাঁক প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটে এই পর্বে।

জীবন যুদ্ধের লড়াই-এ সেই সময় আমরা এক অন্য সুবোধকে দেখি। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুবক সুবোধ কিন্তু ভেঙে পড়েননি। যে কোন পেশায় যে কোন পরিবেশে মানিয়ে চলার যে এক অসম্ভব ক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, তা-ই তাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ এর সময়সীমার মধ্যে অনতিক্রম্য যে মুখ্য ঘটনাগুলো মানুষের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, চাওয়া-পাওয়া, বিবেক-বিবেচনার সমস্ত হিসেব-নিকেশ ওলট-পালট করে দিয়েছিল; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং দেশ-বিভাজন সেই ঘটনাগুলোর অন্যতম। স্বল্প সময়সীমায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই ঘটনাপ্রবাহের একাদিক্রমিক আক্রমণে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে 'পরিবর্তন' অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়ে। পরিবর্তন দেখা দেয় সমাজ জীবনে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, পোশাকে, আচার-আচরণে এমনকি মানবিক মূল্যবোধ এবং কাব্য-সাহিত্যেও।

পনের বছর বয়সের সুবোধকে রোজ সকালে এক মাইল পথ হেঁটে উকিলবাবুর বাচ্চা ছেলেদের পড়াতে গিয়ে কঠোর এক সাংসারিক সত্যের স্বাদ পেতে হয়েছে। দশ টাকা মাইনের মাস্টারের একদিনের গরহাজিরা ক্ষমা করতে পারলেন না বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত উকিলবাবু। 'পাঁচ আনা কেটে রেখে ন'টাকা এগারো আনা দিলেন।'[৯] আবার অন্য ঘটনায় এর বিপরীত সত্যের প্রকাশও তিনি দেখেছেন।
ক্ষুদ্র এক ধর্মশালার পাঁচ টাকা মাইনের দারোয়ান তার দুপুরবেলার আহারের দুটি মোটা বজরা রুটির একটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলে গেছে-—

> আপনি আজ এখনও কিছু খাননি বলে মনে হচ্ছে, তাই আমিও খেতে পারছি না। রুটিটা এখনই খেয়ে নিন।[৯]

সুবোধ ঘোষ লিখেছেন এইসব ঘটনার ভিতর থেকেই উঠে এসেছিল তাঁর প্রত্যয়ের ভিত্তি।

মাত্র ১৫ বছর বয়েস। তিনি হন্যে হয়ে একটি চাকুরী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, যে কোন বেতনের, যে কোন শর্তের। একান্ত জরুরী একটি বাঁধা আয়ের নিশ্চিত আশ্বাস। টানা তিন সপ্তাহ আহার নিদ্রা প্রায় বর্জন করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। অতি কম খরচে মুড়ি, ছাতু কিংবা পাউরুটিই ছিল তার পেট

ভরানোর প্রধান উপকরণ। রাত্রিবেলায় বাড়ি ফিরতেন একটু দেরী করেই। চেষ্টা করতেন যাতে মা-বাবার মুখোমুখি হতে না হয়। আশঙ্কা একটিই। তাঁরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন কাজ কিছু জুটল কিনা। না-বাচক উত্তর দেওয়াটাতে সুবোধের ছিল অস্বস্তি। প্রায়ই রাত্রে বাড়ি ফিরে খাবার জন্য রান্নাঘরের দিকে যেতে পা সরতো না তার লজ্জায় এবং অভিমানে। জল খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন অনেক রাত। দুঃখের রাত দীর্ঘতর মনে হলেও, ভোর আসে। সুবোধচন্দ্র একটি চাকুরী পেয়েছেন। হাজারিবাগে কলেরার টীকা দেওয়ার চাকরি।

পরবর্তীকালে সুবোধ ঘোষের পুত্র উত্তম এ বিষয়ে বেশ নাটকীয়ভাবে পরিবারের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তাঁদের স্বার্থপরতার প্রকৃতিও উদ্ঘাটন করেছেন এই বলে 'এতো হচ্ছে সন্তানকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ যাতে, আমরা ক'জন নিরাপত্তার আশ্রয়ে যদ্দিন সম্ভব বেঁচে থাকতে পারি।'[১১] হয়ত এই স্বার্থপরতাটুকু অনুচ্চারিত হলেও অভাবনীয় ছিল না। কিন্তু এও ভাববার যে কতোটা নিঃসহায় হয়ে পড়লে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষকে এরকম একটি ঝুঁকি নিতে বাধ্য হতে হয়। জানিনা এর পেছনে পারিবারিক সম্পর্কেরও কোনো টানাপোড়েন ছিল কিনা। কেননা যে রূঢ়তার সঙ্গে উত্তম এর অন্তর্নিহিত স্বার্থপরতাটুকুকে তুলে আনেন তার পেছনে একটা কোনো অন্তর্গূঢ় উষ্মা থেকে যাওয়াই সম্ভব। সুবোধের সেই চাকরি পাবার পূর্ববর্তী দিনগুলির সম্বন্ধে উত্তমের যে বিশ্লেষণ, তাতে পাই সুবোধ অনেকদিনই রাত্রে বাড়িতে খেতেন না, 'রান্নাঘরে সর্বশেষ আহারী হিসেবে ঢুকতে ইচ্ছে থাকত না'[১২] এর কি কোনো কারণ ছিল? আর সেই ইতিবৃত্তে কি কোনো গ্লানি ছিল যার ফলেই তাকে অন্তত সেই সময় এই চাকরি নিতে বাধ্য হতে হয়? উত্তম লিখেছেন বাস্তবের কঠোরতা বাবা মার মনের আবেগ ও মমতাকে পরাস্ত করে সুবোধকে এমন চাকরিতে যোগ দিতে দিয়েছিল। তা সম্ভব। তবে এও লক্ষণীয় যে যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি এমনভাবে মধ্যবিত্তের শিকড়ে টান দিয়েছে যাতে আর্থনীতিক ভাঙন তার সম্পর্কের জড়কেও ভেঙে দিচ্ছে। ভেঙে পড়তে চলেছে পুরানো মূল্যবোধ ও সম্পর্ক একান্নবর্তী পরিবারের অবস্থা এবং পরিবারের প্রতি মমত্ব। হয়তো তারই কোনো কোনো ইঙ্গিত থেকে যায় উত্তম ঘোষের সুবোধচন্দ্রের চরিত্র ব্যাখ্যায়। হাজারিবাগের পৌরসভা সাহসী সুবোধকে একটি প্রশংসাপত্র দিয়েছিল। তাঁর সেই ছ-সাত মাসের ভীষন অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী লেখায় প্রত্যক্ষভাবে নেই। কিন্তু জীবনের নির্মোহ বিশ্লেষনে এই সম্পর্কের ভাঙন ও পরিবারের এই বাস্তবধর্মী মানসিকতা নিশ্চয় একটা বড় ভূমিকা নিতে পেরেছিল।

ছ মাসের টীকা দেবার চাকরি যাবার পর আবার নূতন করে কাজের সন্ধান করতে হল। তখন তিনি কিছুদিন বাসের কন্ডাক্টারের চাকরি নিয়েছিলেন। হাজারিবাগের লাল মোটর কম্পানিতে নাইট বাস সার্ভিসের কন্ডাক্টর। ছোটনাগপুরের মঙ্গলপাহাড়ী অঞ্চলের জঙ্গল পথে রাতের এই বাসে তিনি বহুদিন চাকরি করেছেন। এই সময়কার একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলেছেন তাঁর 'সেদিনের আলোছায়া' নামক রচনায়। বাস কন্ডাক্টর হিসেবে তিনি ছোট্ট হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর কন্যার কাছে জল চেয়ে খেয়েছিলেন। সে স্মৃতি তাঁর মনে এক বিস্ময়ের রহস্য জগৎ খুলে দিয়েছিল। 'কী আশ্চর্য ডাক্তার বাবুর মেয়ের দুই চোখ জলে ভরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে গেল'[১৩]। এর ভিতরে তিনি খুঁজেছেন জীবনের রহস্য।

মুকুলরাণী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন 'গল্পতে যে ড্রাইভারের চরিত্রটা বিমল, ঐ নামে ওঁর এক বন্ধুর সত্যিই একটা খুব ভাঙা গাড়ি ছিল।' ঐ গাড়িই ছিল তাঁর 'অযান্ত্রিক' গল্পের মূল উপাদান। কিন্তু তারও পরে থেকে যায় নানাবিধ যন্ত্রাংশ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যা – গাড়ী সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই সম্ভবত আহৃত হয়েছিল। মনে হয়, বিমলের জগদ্দলের পেছনে এই সময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহায্য করে থাকবে। শুধু গাড়ী নয়, এই কাজে বহু মানুষের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় ঘটে তাই তার এই কর্মের সঙ্গে অতিরিক্ত পাওনা।

সুবোধ ঘোষের ব্যক্তিজীবন পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় সম্পর্কে নি:সন্দেহ হওয়া চলে। তাঁর বাল্য কৈশোর এবং যৌবনের প্রথম পর্বের দিনগুলো অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি সেই দিনগুলোর কথা অর্থাৎ হাজারিবাগের দিনলিপি, সযত্নে ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি। এই অভিমানের কারনেই হয়ত সুবোধ ঘোষ পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে যাবার পর দ্বিতীয়বার আর সে বাড়িতে প্রবেশ করেননি। বাড়িটি বিক্রী করে দেবার প্রস্তাব এলে দ্বিধাহীন ভাবে স্বাক্ষর করেছেন দলিলে। কিন্তু মনের গভীরে সঞ্চিত বেদনা দিনগুলোর অভিজ্ঞতাকে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন তার গল্পে। তাই তাঁর অনেক গল্পের প্রেক্ষাপটেই রয়েছে বাংলা-বিহার সীমান্তের হাজারিবাগ, পালামৌ, রাঁচি, রাজগীর, মধুপুর প্রভৃতি জায়গাগুলো এবং সেই সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথা। উত্তম ঘোষের কথা থেকে জানতে পারি—

> ... সুবোধ ঘোষ তাঁর ২৫/২৬ বছর বয়সের মাথায় সেই যে হাজারীবাগ ছেড়ে কলকাতা চলে এলেন, তারপর আর কখনও সেখানে একবারের জন্যও যাননি। কেন ? সঠিক জবাব পাওয়া সুকঠিন। পরবর্তীকালে যখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত সেখান থেকে ডাক আসেনি তা নয়। কিন্তু একটু বিশেষ ধরণের অনাগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কথায় ও লেখায় যে ব্যক্তির প্রতিনিয়ত হাজারীবাগের উল্লেখ থাকত, পরবর্তীকালে পালামৌ-রাঁচী পর্যন্ত যিনি ঘুরে এসেছেন, তিনি কিছুতেই পিতৃকুলের সেই অঞ্চলে, সেই বাড়িটিতে আর দ্বিতীয়বার প্রবেশ করতে চাইলেন না। কেন ? বরঞ্চ আমাদের কৈশোরে আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি — পৈতৃক বসতবাটি বিক্রী করে দেওয়ার জন্য অগ্রজ সুধীর ঘোষের বৈষয়িক কাগজপত্রে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে স্বাক্ষরদান করেছেন।[১৫]

উত্তম অনুমান করেছেন এর পেছনে হয়ত সুবোধ ঘোষের কোনো অভিমান লুকোনো আছে। এই অভিমানের কারণ অনুসন্ধান করে উত্তম বলেছেন 'মনে হয় বাল্যস্মৃতির আঘাত, তিক্ততাগুলো ভুলে থাকার চেষ্টা, যে আঘাতের স্মৃতির সাথে আজকের শান্তির দিনে নূতন করে পরিচয় পাতাতে তিনি ইচ্ছুক নন।'[১৬]

সুবোধ ঘোষ ছিলেন মনে প্রানে একজন আদর্শনিষ্ঠ মানুষ। বাস্তবের নানা জটিলতার ভিতরে বড় হলেও সেই অন্তরের আদর্শকে তিনি কোনোদিন ভোলেন নি। নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং নির্ভয়ে সেই আত্মবিশ্বাসকে কার্যে রূপায়িত করা এই দুয়ের সাহায্যেই তিনি সারাজীবন সমস্ত প্রতিবেশের মুখোমুখি হতে পেরেছেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন তিনি জীবনে কারো কোন ক্ষতি করেন নি—সুতরাং কাউকে ভয় পাবার প্রশ্নই আসেনি। তাঁর এই আত্মবিশ্বাস ও নির্ভীকতা অনেকের কাছে অহমিকা বলে মনে হয়েছে, দাম্ভিকতা বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তিনি নিজের বিশ্বাসকে মূল্য দিতেন। এই প্রসঙ্গে সুবোধ ঘোষ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন —

> নির্ভয়ের ওই তত্ত্ব আমার একটি অভিজ্ঞতার উপহার, একটি ঘটনার শিক্ষা। সেই ঘটনার স্মৃতিচ্ছবির মধ্যে আজও স্পষ্ট করে দেখতে পাই, ধবধবে ফর্সা ও অত্যন্ত রোগা চেহারার এক পাঠকজী ঘন-সন্ধ্যার অন্ধকারে তুলসী মন্ডপের চাতালের উপর একটি বাতি রেখে রামায়ণ পড়ছেন। সহসা এক ব্যক্তি ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠলো, ভাগিয়ে পাঠকজী ওরা রওনা হয়েছে, ওরা আজ রাত্রিতেই আপনাকে খুন করবে। ওরা মানে, পাঠকজীর দেশ-গাঁয়ের তিন জ্ঞাতি-ব্যক্তি যারা পাঠকজীকে তাদের ভূসম্পত্তির একটি সমস্যা বলে মনে

করে। পাঠকজী বললেন — আসুক ওরা। আমি এখান থেকে নড়বো না। প্রশ্ন করেছিলাম : আপনার ভয় করছে না ? পাঠকজী বললেন - শোন বাবা, আমি জীবনে কারও কোন ক্ষতি করিনি। তাই আমি কাউকে ভয় করিনা। ... তোমারও কোনদিন কাউকে ভয় করার দরকার হবে না, যদি জীবনে কারও কোন ক্ষতি না কর। মনে পড়ে, পাঠকজীর কথার আবেশ যেন আমার প্রাণের উপর সঞ্চারিত হয়ে সেদিন আমাকে একটি পরম বিশ্বাসে দীক্ষিত করে দিয়েছিল।[১৭]

এই বিশ্বাসবোধ তাঁকে জীবনপথে চালিত করেছে। স্পষ্টই বলা যায় এ বিশ্বাস কোনো বাস্তববাদীর নয়, এক আদর্শজীবী মানুষের।

জীবিকার প্রয়োজনে একটি সার্কাসের দলে তিনি কিছুদিন মজুরের কাজ করেছেন। সার্কাসের প্রতিটি প্রদর্শনীর শুরু ও শেষে লটবহর টেনে ঠিক কি পরিমাণ অর্থ এই দামাল কিশোরের ভাগ্যে জুটত —তার উল্লেখ কোথাও নেই। কিন্তু হিসেবটা অন্যত্র। যেখানে পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরী জোটে নি, দেখা গেছে — সেখানকার অর্জিত অভিজ্ঞতা সুবোধ ঘোষকে জুগিয়েছে সাহিত্যের রসদ। ঐ সার্কাস দলের সঙ্গে থাকার সময়ই তাঁর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হয়েছিল ট্রাপিজ মাস্টার চনাপ্পার সঙ্গে, পরিচয় হয়েছিল ঐ সার্কাসের অন্যতম আকর্ষণ জোকার কর্ণেল পটাটো দাশগুপ্ত এবং মিস্ সুধালক্ষ্মীর সঙ্গে। এই চরিত্রগুলোকে নিয়েই পরবর্তীকালে প্রকাশিত হ'ল তাঁর সাহিত্যকীর্তি 'বিচিত্রাঙ্গদা'।

শুধুমাত্র বিচিত্র জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলেই যে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা নয়। এই বাংলায় হয়ত অনেক বাঙালীর জীবনে আরও কষ্টকর অভিজ্ঞতাও রয়েছে। সাহিত্য রচনার পরিকল্পনা, সাহিত্যোপযোগী ভাষা, পরিমিতি জ্ঞান এবং সর্বোপরি পরিবেশনের বিশেষ গুণ ছাড়াও অন্য আর দশজনের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতায়। হয়ত জীবনের বৈচিত্র্যের প্রতি এই আকর্ষণেই মাস দুয়েকের জন্য হঠাৎ সন্ন্যাসীর বেশ ধরে বাড়ী থেকে উধাও হয়েছিল তিনি। উত্তম ঘোষ এই সন্ন্যাসযাত্রার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন —

...হঠাৎই সন্ন্যাসীর বেশ ধরে উধাও হয়েছিলেন তিনি। সেই তরুণ বয়সেই। বলা বাহুল্য, সেটা আদৌ কোন পরমার্থ কামনায় নয় — বরঞ্চ একটা মজাদার বহুরূপী সাজার তাগিদে। ভরদুপুরে লুকিয়ে লুঙ্গি ও ফতুয়া গৈরিক রঙে রাঙিয়ে নেওয়ার সময় বড় বৌদির প্রশ্নের উত্তরে সুবোধ জানিয়েছিল,—এগুলো ক্লাবের আগামী যাত্রাপালার সাজ-সামগ্রীর প্রস্তুতি। সুতরাং কেউ সন্দেহ করে নি।[১৮]

তিনি গভীর রাতে হাজারিবাগের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ভোর রাতে নদীর ঘাটে মস্তকমুণ্ডন করে পুরোপুরি সন্ন্যাসী সেজে বাড়ি থেকে চলে গেলেন।

অনেক খুঁজে পেতে সন্ধান পাওয়া গেল, দক্ষিণেশ্বরে আদ্যাপীঠের যে আশ্রম আছে উনি সেখানে গিয়ে রয়েছেন। বাড়ির থেকে বড়রা গিয়ে অনেক বুঝিয়ে শেষে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।[১৯]

উত্তমের লেখা থেকে জানতে পারি ফেরার সময় টিকিটের পয়সাও যোগাড় হয়েছিল বিচিত্র পথে। হাজারিবাগের ট্রেন ধরার আগের দিন বেনারসের গঙ্গায় স্নান করে, ফোটা তিলক কেটে, ধুতির প্রান্তভাগ

সামনে রেখে একটি বটগাছের তলায় ধ্যানের ভঙ্গিতে পাক্কা তিন ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছিল। স্নানার্থী পুণ্যার্থীরা বেশিরভাগই বৃদ্ধা— আহা কাদের বাছা গো, এই বয়সে বিবাগী হ'য়েছে- ইত্যাদি সমবেদনা জানানোর সাথে-সাথে যে দু'চার পয়সা ধুতির প্রান্তে দান করেছিল সেটাই তার ফেরার টিকিট ও দেড় দিনের পথখরচার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল। তরুণ সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেও সুবোধ ঘোষ কিন্তু একবারের জন্যও ঈশ্বর বা ঈশ্বর সাধনার বিষয়ে মনযোগী ছিলেন না। তিনি একান্তভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়াকে। তীর্থস্থান ও তীর্থযাত্রীদের বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সন্ন্যাসী হয়ে মানুষের বহুরূপ দর্শন করেছেন। সে সময় ধর্মশালা, মন্দির ও মঠে তাঁর মোটামুটি আহার জুটে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে সন্ন্যাসীর বেশভূষা ছেড়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে আবার বেরিয়ে পড়তে হল জীবিকার সন্ধানে। বোম্বাই পাড়ি দিলেন তিনি। এবার আর চাকুরি নয়, নিজস্ব ব্যবসায়। পরিশ্রম অনেক বেশি, কারণ প্রয়োজনও বেশি। বাড়িতে নিয়মিতভাবে অর্থ পাঠাতেই হবে। শুরু হলো বেকার যুবকের বেকারীর ব্যবসায়। পাইকারী দরে কেক, রুটি বিস্কুট ইত্যাদি কিনে নিয়ে সামান্য বেশি মূল্যে খুচরো দোকানে বিক্রী করা। স্বনিযুক্তির এই পেশায় তাঁর সর্বক্ষণের একমাত্র সঙ্গী, একটি সাইকেল। কাকভোরে সাইকেল নিয়ে বেরোতেন। সামনে পেছনে বেশ ক'টি থলেতে মালপত্র ভর্তি করে দোকানে দোকানে সরবরাহ করতেন সকাল আটটা পর্যন্ত। তারপর প্রাতঃকালীন জলযোগ সারতেন একথালা ছাতু দিয়ে। রুচি পরিবর্তনের জন্য ছাতুর পরিবর্তে কোনদিন বা খেতেন ভুট্টা। অবিক্রীত মাল নিয়ে আবার বেরোতেন দুপুরে। দুপুরের মধ্যে সব মাল বিক্রী না হলে বিকেলেও ঘুরতে হ'ত দোকানে দোকানে। বিকেল চারটে নাগাদ ছিল তাঁর দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময়। তাঁর নিজস্ব এক চিলতে ঘরেই রাখা থাকত বরাদ্দ খাবার। এক ডজন হাতে গড়া রুটি, দু'বাটি অড়হর ডাল, একটুকরো পেঁয়াজ আর বড় এক ঘটি জল। রাতের খাবার অতিরিক্ত দুধ সহযোগে বড় এক গ্লাস চা। উত্তম জানিয়েছেন বোম্বাই-এ থাকার সময় সুবোধচন্দ্র নির্মমভাবে নিজের খাদ্যতালিকা ছাঁটাই করেছিলেন, হাজারিবাগের অভাবক্লিষ্ট মানুষগুলোর কথা ভেবেই। পরে সপরিবারে খাবার টেবিলে বসে নিজেই স্বীকার করেছেন সে কথা। যে কোন পরিবেশে মানিয়ে নিতে এবং শত সমস্যাতেও ঠান্ডা মাথায় নিজ কর্তব্য করে যেতে সুবোধচন্দ্রের জুড়ি ছিল না। উত্তম ঘোষ লিখেছেন—

> পরবর্তী জীবনে খাবার টেবিলে ছিল বাবার কাহিনীর আসর। বাবা বলতেন —না আমার কোন অসুবিধা হয়নি। কোনদিন রাতে ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম ভাঙেনি। ভোর বেলায় কাজে যেতে কোন এনার্জির অভাব হয় নি। শরীরও মোটামুটি ঠিক ছিল।... যদিও সাতমাস পরে বাড়ি ফেরার পর একমাত্র বৌদি বলেছিল — বেশ রোগা হ'য়ে গেছ ঠাকুরপো। হাসতে হাসতে বলেছিলেন বাবা — 'বৌদি আমায় ভীষণ ভালবাসত। তাই বোধহয় তার নজরে আমায় রোগা লেগেছিল। আর কেউ কিন্তু বলেনি।' ... আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি কোন কষ্ট পাইনি এই একবেলা 'খাওয়ায়', কি শরীরে কি মনে, বেশতো ছিলাম।[২০]

সুবোধ ঘোষের ব্যক্তিজীবন এরকম নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। জীবনের সেইসব দুঃখকর দিনগুলো অতিক্রম করে আসার পর তার অভিজ্ঞতা কেবল স্মৃতিরূপে থেকে গিয়েছিল। তার বেদনার কোন লেশ আর ছিল না।

বিমান থেকে একটি এলাকার বা বসতির চিত্র যে ভাবে দর্শকের চোখে ফুটে ওঠে সবটুকু রঙ রূপ নিয়ে, মাটিতে দাঁড়িয়ে মানচিত্র দেখে তার ভগ্নাংশও অনুভূত হয় না। যে সব আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু

সহকর্মী, সুবোধ ঘোষের প্রথম জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, জীবনপথে যারা সঙ্গী হয়েছিলেন, তাদের অনেকের অন্তরই ঐ তরুণ কিশোরের কৃচ্ছসাধনে বেদনার্ত হয়েছে। কারন তারা সুবোধবাবুর জীবনের এক একটি খন্ডচিত্র দেখেছেন, মাটিতে দাঁড়িয়ে মানচিত্র দেখে একটি এলাকার সামগ্রিক চিত্র প্রত্যক্ষ করার মত ! কিন্তু এখন, বিমান থেকে প্রত্যক্ষ করার মত সুবোধ ঘোষের পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র আমাদের চোখে ফুটে ওঠায় অবশ্যই মনে হয় যে — এই সাহিত্যিকের প্রথম জীবনের খন্ডচিত্রগুলো আপাতদৃষ্টিতে কষ্টকর হলেও, সামগ্রিকভাবে একটি সফল ও পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র। প্রকৃতপক্ষে, কৈশোর এবং যৌবনের কষ্টকর অভিজ্ঞতাপূর্ণ দিনগুলোর ওপর ভর করেই বাংলা কথা-সাহিত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সুবোধচন্দ্র। প্রথম জীবনের দারিদ্র্য ও বঞ্চনাই তাঁর পরবর্তী জীবনের সৃষ্টিসুখের ভিত্তি। এই স্বীকারোক্তি করেছেন সুবোধ ঘোষ স্বয়ং। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল বিচিত্র জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে। বই পড়া এবং শোনা ছিল তার ভিত্তি।

> আমার বিশ্বাস, এ রকম অনেক ঘটনার ভিতরেও নিকটে থাকবার অভিজ্ঞতা আমার অনুভব ও প্রত্যয়ের সম্বল সৃষ্টি করেছে। কৈশোর কালের আর একটি প্রাপ্ত সম্বলের কথা মনে পড়ে, যার রূপটা বস্তুত রূপকথার মত একটি আবেশ দিয়ে গড়া। পিতামহের বন্ধু রায়বাহাদুর পার্বতীনাথ দত্ত, যিনি ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর, তিনি নদী পাহাড় সমুদ্র ও পাথরের অনেক মজার মজার গল্প বলতেন, বড় বড় প্রাণীর হাড় পাথর-চাপা পড়ে ফসিল হয়ে যায়।[২১]

একদিকে যেমন জীবন থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন তেমনি সাহিত্য ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব পাঠ করে জ্ঞানের পথ খোলা রেখে চলেছিলেন তিনি। নিজের এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিন ধরণের উপায়ের কথা বলেছেন সুবোধবাবু —

> ১। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ২। বিজ্ঞ মানুষের কাছে শোনা এবং
> ৩। গ্রন্থ পাঠ।

তার লেখা থেকে পাই —

> মহিলাকবি কামিনী রায় আমাদের বাড়ীতে আসতেন। তিনি তাঁর লেখা দু'টি বই, 'গুঞ্জন' ও 'অশোক সঙ্গীত' উপহার দিয়েছিলেন। অর্থ বুঝতে পারিনি, কিন্তু কবিতার কথাগুলি মনের মধ্যে যে ঝঙ্কার জাগিয়ে তুলতো তার মধুরতা অনুভব করতে কোন অসুবিধাই হতো না।
>
> আমরা দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হলেও আমাদের বাড়ীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রায়ই হতো। আচার্যের প্রার্থনায় ভাব ও ভাষার অনেক কিছু বুঝতে না পেরেও মুগ্ধ হতাম। পিতামহের টেবিলের উপর রাখা একখন্ড ব্রহ্মসঙ্গীত আদ্যোপান্ত বারবার পড়েছি। বয়সটা তখন যদিও সেইসব সঙ্গীতের তত্ত্ব ও তাৎপর্য বুঝবার মতো যোগ্যতার বয়স নয়, তবু একটা নতুন রকমের তৃপ্তি বোধ করতাম। আমার ধারণা আচার্যদের প্রার্থনার ভাষা ও ব্রহ্ম সঙ্গীতের ভাষা আমার সেই কিশোর মনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ভাষার সম্বল তৈরী করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের লাইব্রেরি ছিল আমার নিজের ইচ্ছানুচালিত শিক্ষার এক বড় সহায়। আমার এই আত্মনির্ভর শিক্ষার সিলেবাসে কাহিনী-সাহিত্যের কোন স্থান একরকম ছিল না বললেই চলে। ইতিহাস ও দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বই পড়বার দিকে আমার বেশী ঝোঁক ছিল। রাঁচী নিবাসী বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার কোন সুযোগ হয়ে ওঠেনি,

তাঁর লেখা আদিবাসী জীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কৌতূহল উদ্বোধিত হয়েছিল ।

সুবোধ তখন হাজারিবাগ সেন্ট কলাম্বাস কলেজে প্রথম বছরের ছাত্র। নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের ছেলে রমেশ ছিলেন তাঁর সহপাঠী। রমেশের কাছে লেখক আগ্রহ নিয়ে শুনতেন তাঁর বাবার গবেষণা এবং নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংগ্রহ সম্পর্কে নানা কথা। সুবোধবাবু বলেছেন —

> রমেশের মুখ থেকে তার পিতার গবেষণা ও নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংগ্রহ সম্পর্কে কিছু পরিচয়ের কথা শুনেছিলাম। যে-টুকু শুনেছিলাম তারই মধ্যে যেন আবেদনময় একটি সংকেত ছিল। কৃতী নৃতাত্ত্বিক হবার একটি আকাঙ্ক্ষার সংকেত। যাই হোক্ আকাঙ্ক্ষা থাকলেও নৃতাত্ত্বিক হতে পারিনি। ভূতাত্ত্বিক কিংবা সঙ্গীত রচয়িতা কবি হতেও পারিনি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি, সেদিনের সেইসব আবেশ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঞ্চয় আমার গল্প লেখা ও উপন্যাস লেখা প্রয়াসেরই একটি সহায়ক সম্বলে পরিণত হয়েছে।[২২]

এই উক্তি থেকে তাঁর শিক্ষার ভূমিকাটুকু বোঝা যায়। আমরা সুবোধ ঘোষের মানসিকতার বৈশিষ্ট্য বুঝতে আগেই উল্লেখ করেছি তাঁর মনের আদর্শনিষ্ঠার কথা। তিনি এই আদর্শনিষ্ঠার ভিত্তির উপরেই ন্যস্ত করেছিলেন তাঁর জীবনবোধের ধারণা। তথাকথিত চারিত্রিক শুচিতার চাইতে তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল মনুষত্ববোধ। তিনি অনুভব করেছেন মানুষের বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে মনুষ্যত্ব সর্বগুণান্বিত এবং সর্বোত্তম। কারণ, এই মনুষত্বই শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচতে শেখায় না, অন্যকে বাঁচাতে নৈতিক শক্তি যোগায়। এই প্রসঙ্গে সুবোধ ঘোষ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর 'সুরেশদা'র কথা। এই সুরেশদার প্রতি সুবোধ ঘোষের শুধুমাত্র শ্রদ্ধাই ছিল না, এই চরিত্রটি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে মাঝে মধ্যেই এই সুরেশদার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সুরেশদা সম্পর্কে সুবোধ ঘোষ স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন —

> জীবনে বহু ঘটনা যেমন আপনি দেখা দিয়ে সত্য-মিথ্যার নির্ণয় স্পষ্টতর করে দিয়েছে, তেমনি মাঝে মাঝে যেন প্রাণের এক একটি জিজ্ঞাসার আহ্বানে ঘটনা এসেছে ও শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে।
>
> মনুষ্যত্ব, মহত্ব ও মরালিটি এই তিনটি সুকৃতি একই সূত্রে গাঁথা, কোনটিও কারও সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক এককতায় সত্য হয়ে উঠতে পারে না। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের প্রত্যেকটি মৃদু অথবা কঠিন অনুজ্ঞা এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। আমিও গুরু চিন্তার অনেক বই লঘু প্রকারে পাঠ করেও এই সুদৃঢ় প্রত্যয় লাভ করেছিলাম যে হ্যাঁ ওই মরালিটি ও মনুষ্যত্ব এবং মহত্ব একই সম্বন্ধিত ত্রিভূজের তিন বাহু। একটি ছাড়া অন্য দুটির কেউই সত্য হতে পারে না। মরালিটি বলতে সাধারণ অর্থে চারিত্রিক শুচিতা বোঝায়। এবং চারিত্রিক শুচিতা বলতে বিশেষভাবে কি বোঝায়, সেটা অজ্ঞ অদার্শনিক জনেরও অজানা নয়।[২৩]

চল্লিশ বছর আগের সুরেশদার একদিনের একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছেন—

> সুরেশদাকে আজও দেখতে পাই; তাঁর মাথায় টাক ছিল, আর গায়ে ছিল আধ-ময়লা একটি টুইল কাপড়ের কামিজ। কামিজের দুই আস্তিন গোটানো থাকতো বলেই স্পষ্ট করে দেখতে পেতাম, ত্রিশ বছর বয়সের সুরেশদার হাত দুটি একটু রোগা হলেও বেশ মজবুত। চলতি মতের সাধারণ অর্থে যাকে

চারিত্রিক শুচিতা বলে, তার সামান্যতম খ্যাতিও সুরেশদার জীবনে ছিল না। মদের একটি পাইট বোতলের ভারে তাঁর কামিজের একটি পকেট ঝুলে থাকতো। রাতের পাহারাদার পুলিশ সুরেশদাকে প্রায়ই পতিতা-পল্লীর আনাচে-কানাচে হল্লা করে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পেত আর ধরে নিয়ে গিয়ে থানার হাজত ঘরে ঢুকিয়ে দিত। এহেন সুরেশদার চিমড়ে মুখটাকেই একদিন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পুরুষের মুখ বলে মনে হয়েছিল।[২৪]

এ পর্যন্ত সুরেশদার যে পরিচয় আমরা পেলাম তাতে ঘটনাটি জানতে অবশ্যই উৎসাহ জাগে। কি এমন ঘটনা যাতে এই সুরেশদার মুখটিকেই সবচেয়ে সুন্দর মুখ বলে মনে হয়েছিল। নিছক উৎসাহ ছাড়াও গল্পটি আমাদের জানা প্রয়োজন কারণ সুবোধবাবুর কথাসাহিত্য আলোচনার সময় আমরা লক্ষ্য করবো যে এই সুরেশদা চরিত্রটি লেখকের গল্পে নানাভাবেই এসেছে। সেদিনের আলোছায়া-তে লেখক ঘটনাটির বর্ণনা করেছেন —

সে রাতে কুমোরপাড়ার একটা বাড়ির চালাতে আগুন লেগেছিল। বাঁশের ঠাট দিয়ে তৈরী চালাটা দাউ-দাউ কার জ্বলছিল। কুমোরপাড়ার আর্ত চিৎকারে মাঝরাতের ঘুম আর স্তব্ধতা ভেঙে গিয়েছিল বলেই শহরের অনেক মানুষ ছুটে এসে কুমোরপাড়ার আগুন-লাগা বাড়িটার কাছে, তার মানে নিরাপদ ব্যবধান রেখে একটু দূরে এসে ভীড় করেছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে কে না ছিলেন ? বিদ্বান অধ্যাপক, সেবা মিশনের সন্ন্যাসী, উকিলবাবু ও ডাক্তারবাবু, কলেজের ছাত্র, লাঠিয়াল বলে সুখ্যাত ডোম ও গয়লা এবং থানার দারোগা ও সাত আটজন পুলিস কনেস্টবল। নৈষ্ঠিক ভক্তি ও সাত্ত্বিক বিশ্বাসের জন্য শহরের সবাকার শ্রদ্ধান্বিত তিন যুবক ভদ্রলোকও ছিলেন। আমিও ছিলাম। সকলেরই মনে ও মুখে একটি প্রশ্ন হায়হায় বিলাপের রব তুলে ছটফট করছিল, আগুন-লাগা ওই বাড়ির একটা ঘরের ভিতরে সব্জীওয়ালা সেই বুড়ো ও তার বুড়িকে পুড়ে মরবার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করবে কে ? আগুন যে কুমোরপাড়াকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। উদ্বিগ্ন অথচ অলস সেই বিলাপমুখর জনতার বিলাপ আরও একটু প্রবল হতেই দেখা গেল, এক ব্যক্তি দুরন্ত বেগে ছুটে এসে আর চেঁচিয়ে হাঁক দিচ্ছে—আমার হাতে একটা টাঙি দাও। আর কিছু চাই না, শুধু একটা টাঙি। ভিড়ের একটি লোক দৌড়ে গিয়ে, ভিনপাড়ার একটি বাড়ি থেকে একটি টাঙি যোগাড় করে আবার ফিরে এল। সুরেশদা সেই টাঙির তিন কোপে জ্বলন্ত ঘরের দরজার কপাট তিনটুকরো করে ভেঙে দিলেন। ধোঁয়াভরা ঘরের ভিতরে ঢুকলেন সুরেশদা, বেহুঁশ এক বুড়ো ও তার বুড়ির দুই দেহভার দুই কাঁধের উপর তুলে নিয়ে সুরেশদা আবার বের হয়ে এলেন। বেহুঁশ বুড়ো বুড়িকে খাটিয়াতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল পুলিশ। আর সুরেশদা সড়কের পাশে নালার কিনারায় ঠান্ডা ঘাসের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন অনেকক্ষণ, আমরা ডাক দিলাম — সুরেশদা বলুন, আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে ? সুরেশদা উঠে বসলেন আর বললেন ওরে তোরা আমার জন্য ভাবছিস কেন ? আগে বল বুড়োটা আর বুড়িটা বেঁচে আছে কিনা। আমরা বললাম, হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু বললেন, বেঁচে আছে। সুরেশদা বলেন, বাস তাহলেই হলো।[২৫]

এই আদর্শপ্রবণতার ভিতর থেকে সুবোধচন্দ্র নিজের জীবনের সত্যভিত্তি খুঁজে নিয়েছিলেন। বলাই

বাহুল্য সুরেশদার যে দৃষ্টান্ত থেকে তিনি মনুষ্যত্বের ধারণা খুঁজে পেয়েছেন, সেটা একটা আদর্শ মাত্র। সুবোধচন্দ্র লিখেছেন —

> আমার লেখা গল্প ও উপন্যাসের অনেক ঘটনাতে এই সুরেশদা সামান্যভাবে কিংবা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন জেগেছে মনে, মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের গৌরবে সুরেশদাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন, এমন পূতচরিত্র মানুষ এই সাধারণ মানবতার সংসারে কতজন আছেন ? সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি যে, ওই মরালিটি, তথাকথিত ওই চারিত্রিক শুচিতা সত্যিই একটি শুচিতা এবং ব্যক্তিত্বের একটি বৈভব বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মহত্ব অন্য কোন সত্যের দান।[২৬]

এই যেমন জীবনের একটা সত্য উন্মোচনের দিক – বৃহৎ ঘটনার উচ্চরোলের ভিতর থেকে মানুষের কাজের মূল্যে ফুটে ওঠা মানবিকতার উচ্চারণ। একদিকে বৃহৎ অন্যদিকে সামান্য দুয়ের ভিতরেই তিনি সেই মানবিক মহত্ত্বের উচ্চারণ খুঁজে পেয়েছেন।

> ... জীবনের নানা ঘটনার পথে এমন কিছু চোখের জলের ও স্মিতহাসির সাক্ষাৎ পেতে হয়েছে, যার রূপ ও বিচিত্রতা নিয়মের শাসনবন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি রহস্যের প্রকাশ বলে মনে হয়েছে। পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে প্রখ্যাত ট্রাঙ্ক রোডের উপর ডুমরির ডাক বাংলার সামনে গিরিডি-ধানবাদ সার্ভিস বাস ক্ষণবিরামের জন্য থেমেছে; বিশ বছর বয়সের বাস-কান্ডাক্টার জেলা-বোর্ডের ছোট্ট হাসপাতাল ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুর মেয়ের কাছে এক গ্লাস জল চেয়েছে। ডাক্তারবাবুর মেয়ে পাটনার কলেজে পড়ে, এখন গ্রীষ্মের ছুটি, তাই সে এখন ডুমরিতে আছে। দুজনের কেউই আগে কখনো কাউকে দেখেনি। আজ এই প্রথম সাক্ষাৎ। জল খেয়ে নিয়ে বিশবছর বয়সের বাস কন্ডাক্টার আরও পাঁচটা মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, আর, ডাক্তারবাবুর সেই কলেজ-পড়া মেয়েও পাঁচ মিনিটকাল শূন্য গেলাস হাতে নিয়ে, কিন্তু নীরব হয়ে ও অন্যদিকে তাকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সার্ভিস বাসের হর্ন বেজে ওঠে; চলে যাবার সময় হয়েছে। কাজেই বিশবছর বয়সের সেই বাস কন্ডাক্টরকেও তখন হাসপাতালের বারান্দা ছেড়ে ও ব্যস্ত হয়ে চলে যেতে হলো। কী আশ্চর্য, ডাক্তারবাবুর মেয়ের দুই চোখ জলে ভরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে গেল। না, এটা তো নিয়ম নয়, নিতান্ত অনিয়ম। কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মানুষের অন্তর সত্যিই একটি রহস্যের জগৎ, তার হাসি অশ্রু বিষাদ ও উল্লাস সব সময় নিয়ম মেনে চলে না।[২৭]

এই উভয় দিকের মর্মসত্য অনুভব করার ও উদ্ঘাটন করার মন ছিল তাঁর। এই সব অনুভবই লেখায় রেখায় ফুটে উঠতে পেরেছে সেই গভীর মনের তল থেকে।

> জীবনে এ রকম অনিয়মের বিস্ময় অনেক দেখেছি বলেই আমার লেখা অনেক গল্পের মধ্যে সেই বিস্ময়ের আবেগ খুবই সহজে সঞ্চারিত হয়েছে। ডাক্তারবাবুর সেই মেয়েকে হৃদয়বৃত্তির যে বিস্ময় বলে মনে করা চলে, সে বিস্ময় আমি আমার গল্পের অনেক নায়িকার ভালবাসার প্রাণে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছি। অনিয়মের বিস্ময় অথবা বিস্ময়কর এই অনিয়ম অদ্ভুত হয়েও জীবনের যত নিয়মিত মধুরতার চেয়ে অনেক বেশি মধুর।[২৮]

শুধু মানুষের মনই কোন বিস্ময়ের অতলান্ত রহস্য নিয়ে আসে না। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি সেখানেও লুকিয়ে থাকে জীবনরহস্যের সেই বিস্ময়বোধ। বস্তুত জীবনকে দেখার মধ্যে এই বিস্ময়বোধকে অনুভব করার ক্ষমতা কবি শিল্পী অনুভূতিশীলদের একটা শক্তি। রোমান্টিকেরা প্রকৃতির মধ্যে দেখেছিলেন বিস্ময় – মানুষের মধ্যেও ছিল এই বিস্ময়— অষ্টাদশ শতকের গতানুগতিক কাব্যরচনার মধ্যে যা হারিয়ে গিয়েছিল, সেই বিস্ময়কেই ফিরিয়ে এনেছিলেন কবি-শিল্পীরা। সুবোধচন্দ্র মানুষ আর প্রকৃতি উভয় জগৎ থেকেই আবিষ্কার করে এনেছেন জীবনের সেই বিস্ময়চেতনা।

> জঙ্গলের মাথার উপর চাঁদ হাসছে, জঙ্গলের ভিতরে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছেঁড়া-ছেঁড়া জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে, মাঝ রাতের নিরেট নীরবতার মধ্যে বাতাসের শব্দ যেন জঙ্গলের বুকের ভিতরে লুকিয়ে থাকা একটা অপার্থিব মায়ার মদবিহ্বল ইচ্ছার উল্লাস।[২৯]

শুধু কি তাই ! তারও পরে আছে আরও এক বিস্ময়ের অনুভূতি। সেটা মানুষ ও প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে পশু জগতের ভিতরে ফুটে ওঠা এক আশ্চর্যবোধ —

> মানুষের গা ঘেঁষে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বাঘ, চেনা-জানা একটি পোষা বাঘ। জঙ্গলের মায়ার আহ্বান তাকে টেনে নিতে পারলো না। শিকল-বাঁধা ও খাঁচা-বন্দী জীবনের বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত করে দেবার ইচ্ছায় সেই পোষা বাঘকে জঙ্গলের ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই মুক্তি মেনে নিতে পারলো না বাঘ, বলিষ্ঠ এক প্যান্থার। তার গায়ের উষ্ণ স্পর্শটা আমার স্মৃতির বুকে আজও লেগে আছে। একটি গল্প লিখে এই অনুভূতির তর্পণ করেছি।[৩০]

এই ভাবে মানুষ প্রকৃতি আর পশুর জগতের সর্বত্রই যেন অপার রহস্য তাঁর সামনে নিজের আত্ম-উন্মোচন করে তাঁকে দেখাচ্ছে মানব জগতের মহিমা। এই মানুষের জগৎ, অপার বিস্ময়ে ঘেরা, এই প্রকৃতিজগৎ বিস্ময়ের লীলাভূমি এবং পশুর জগতেও কোন পাশবিক নিয়মই কাজ করে না। সেও যে অপার রহস্যময়। এই দুর্গম রহস্যের অনুভূতি সুবোধ ঘোষকে কবি করেছে বললে ভুল হবে না।

তিন

বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব কতকটা আকস্মিক হলেও একেবারে পূর্বপ্রস্তুতিহীন কিনা সে প্রশ্ন তোলা যায়। এ কথা ঠিক যে অনেক কবি বা কথাকার থাকেন যাঁরা প্রকাশ্যে আবির্ভূত হবার আগে সাহিত্যের চর্চা করেন প্রায় অগোচরে। সেভাবে তাঁরা তৈরী হন। সুবোধ ঘোষের পক্ষে সেরকম কোন ইচ্ছাও কাজ করে নি। লেখার কোনরকম অভ্যাস বা প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি রাতারাতি কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ হয়ে গেলেন। যে কোন ভাষার সাহিত্যচর্চায় একজন কথাশিল্পী স্তরে স্তরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যান। এঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ পাঠকের হৃদয় জয় করে সাহিত্যক্ষেত্রে অমরত্ব লাভ করার দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেন। কিন্তু ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি স্কুলের, কলেজের, পাড়ার ক্লাবের কোন সাহিত্য পত্রিকায় কখনো একটি ছত্রও লেখেননি, লেখার কথা ভাবেনওনি। ভবিষ্যতে লেখার কোন অস্পষ্ট পরিকল্পনাও তাঁর ছিল না। সেই সুবোধ ঘোষ প্রথমেই লিখলেন এক প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প 'অযান্ত্রিক'। প্রথম গল্প থেকেই তিনি হয়ে উঠলেন বিস্ময়কর শক্তির অধিকারী। লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সুবোধ ঘোষ জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর

দিকে তাকিয়ে নিজেই বিস্মিত হয়েছেন নিজের সাফল্যে, গভীর বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন নিজেকে। পরিবার পরিজনদের সঙ্গে খাবার টেবিলে বসে এই প্রসঙ্গে সুবোধ ঘোষ বলেছেন —

> ... লেখক হওয়ার জন্য আমার জীবনে কোন আকাঙ্ক্ষার তাগিদ কোনদিনও ছিল না। ... যখন আমার বয়েস ত্রিশ/একত্রিশ তখন আমি প্রথম একটি গল্প লিখেছিলাম। তার আগে আমি কোনদিন গল্প লিখতে চেষ্টা করিনি। হঠাৎ দরকার হয়েছিল, তাই হঠাৎ লিখে ফেলেছিলাম। এছাড়া আমার গল্প লেখার ঘটনা অন্য কোন কার্যকারণ সম্বন্ধের ক্রিয়াফল নয়। ঘটনাটি বস্তুত আকস্মিক, কোন অনুশীলিত প্রয়াসের পরিণাম নয় ...।[৩১]

অথচ এ রকমভাবে একটা গল্প লিখে তিনি যে পরিমাণ প্রশংসা পেলেন সেও বিস্ময়ের। অনেক লেখকের প্রথম লেখাই বিখ্যাত হয়ে ওঠে, হওয়াও সম্ভব। সুবোধ ঘোষের ক্ষেত্রেও সেটা হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য লেখকের রচনার পেছনে যে একটা সংগোপন প্রস্তুতি থাকে, সুবোধ ঘোষের ক্ষেত্রে যেন সেটাও ছিল না। তাই তিনি নিজেও এ নিয়ে বিস্মিত হয়েছেন। এটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, অনেক প্রতিভাবান শিল্পী আকস্মিক আত্মাবিষ্কারে তাঁর নিজের কাছেই রহস্যময় হয়ে ধরা দেন। কবি বাল্মীকি প্রথম শ্লোকটি রচনা করেই বলে উঠেছিলেন 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'। সুবোধচন্দ্র নিজের এই প্রথম গল্প রচনার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন —

> প্রথম প্রয়াসের ফল একটি দুটি গল্প পাঠকজন ও সমালোচকের কাছ থেকে বড় ধরণের কোন অভ্যর্থনা পাবে এটাও নিতান্ত বিরল। প্রায় অসম্ভব ঘটনা বলে ধারণা ছিল। কিন্তু যেটা আশা করতে পারিনি, সেটাই পেলাম, একটু বেশি ক'রেই পেলাম। সেদিনের প্রসন্নতার মধ্যে একটা ভয়ও মুখঢাকা দিয়ে লুকিয়ে ছিল। ভয়টা দুরু দুরু এক প্রশ্নের ভয়। তবে আমি কি সত্যি একজন লেখক হয়ে গেলাম? আরো লিখতে হবে ? সাহিত্যকে যদি একটা মন্দির বলে কল্পনা করি, তবে বলতে পারি, মন্দিরের খোলা দ্বার দেখতে পেয়ে সেদিন ভয়ই পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, দ্বার বন্ধ দেখতে পেলেই ভালো ছিল। ভেতরে প্রবেশ করলেই তো ধূপ-দীপ জ্বালতে হবে। সেটা আমার যোগ্যতায় সম্ভব হ'বে কি হবে না, কে জানে ...।[৩২]

সহজভাবে বলা চলে এই গল্পটি লিখেই সুবোধ ঘোষ নিজেকে চিনতে পারেন, এই গল্প লেখার ফলেই তাঁর আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। যদিও 'অযান্ত্রিক' তাঁর প্রথম ছোটগল্প এবং এই গল্পের পেছনে কোন সাহিত্যসৃষ্টির পরিকল্পনা ছিল না, গল্প লেখার কোন পূর্বঅভিজ্ঞতা ছিল না, তবুও অযান্ত্রিকের পূর্বে একটি প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছিলেন। সুবোধ ঘোষের মতে ঐ প্রবন্ধ ছিল ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত। 'সেদিনের আলোছায়া'য় সুবোধ ঘোষ এ সম্পর্কে লিখেছেন—

> মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত দরকারে বাংলা ভাষায় চিঠি-পত্র লিখতে হতো। এছাড়া বাংলা লেখার কোন চেষ্টা ও চর্চার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। সদাগরী অফিসের কেরানী হিসাবে ইংরেজী ভাষায় অনেক কারবারী চিঠি অবশ্য লিখতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ ধরণের বাংলা ও ইংরেজী চিঠি লেখার সামান্য সাধারণ বৃত্তির মধ্যে ভাষার ও লেখার কোন সৌকর্যের ছায়াও ছিল না, সুযোগও ছিল না। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের হাতের কলমের যে অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, আমার অভিজ্ঞতা তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। তাই আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রথম একটি গল্প লিখে আমি নিজেই প্রথম

> বুঝতে পেরেছিলাম এবং বিস্মিত হয়েছিলাম যে, আমি সেই লেখাও লিখতে পারি, যাকে সাহিত্যের রূপ ও রীতির অনুমোদিত লেখা বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে।
>
> ... ভেবেছিলাম, না, আর নয়। এই প্রথম সোপান থেকেই ফিরে চলে যাওয়া উচিত। আর কখনও কোন গল্প লিখব না। কিন্তু আমার এই সংকল্পের জোর ভেঙে দিলেন আমারই পরিচিত এবং অন্তরঙ্গ কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধু।[৩৩]

সুবোধ ঘোষের ব্যক্তিজীবন দুটি পর্বে স্পষ্ট বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে প্রায় আটাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন জীবন সংগ্রামের এক দুর্বার সৈনিক। কিন্তু তাতে অসাধারণত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। বাংলার এমন বহু তরতাজা যুবককেই জীবনে টিকে থাকার লড়াই করতে হয়। তাদের জীবন-সংগ্রাম কর্মোদ্যম এবং নিষ্ঠা অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাসে অনুল্লিখিত। অথচ সুবোধ ঘোষের জীবন কিন্তু আজ আমাদের কাছে এক অবশ্যপাঠ্য অনুচ্ছেদ। কারণ, সুবোধ ঘোষকে না জানালে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না এবং সুবোধ ঘোষের সাহিত্যপাঠ ছাড়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দ্বিতীয় পর্বের সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ রূপে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের প্রতিভা বা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অন্বেষণকালে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনের প্রথমপর্বে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয় এবং ফলস্বরূপ তাঁর জীবন সংগ্রামের রূপটি উদ্ভাষিত হয়ে ওঠে। দুই পর্বের দুই সুবোধ ঘোষের মিল-অমিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে আমাদের সম্মুখে। মিল নয়, প্রাথমিকভাবে অমিলটাই অনেক বড় হয়ে ধরা পড়ে সাধারণের চোখে। বিস্মিত হয়ে আমরা লক্ষ করি, দুই পর্বের দুই সুবোধ ঘোষের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই যেন নেই। প্রথম পর্বের সুবোধ ঘোষ, চঞ্চল, বন্ধনহারা, এবং ভবঘুরে; দ্বিতীয় পর্বের সুবোধ ঘোষ শান্ত, সমাহিত এবং অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। প্রথম পর্বের সুবোধ ঘোষ শারীর শক্তিকে নির্ভর করে অন্নসংস্থান করেছেন, দ্বিতীয় পর্বের সুবোধ ঘোষ ধীশক্তিতে পরিবার প্রতিপালন করেছেন। একজনের সঙ্গে অন্যজনের মিল নেই, আবার দু'য়ে মিলেই এক এবং পূর্ণাঙ্গ। প্রথম পর্বের সুবোধ দ্বিতীয় পর্বের সুবোধের উত্থান ভূমি। কিন্তু সেটাই সব নয়। কবি প্রতিভাকে প্রাচীন আলংকারিকেরা বলতেন নিয়তিকৃত নিয়মরীতি। শুধু বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতায় কবি হয় না—তার ভিতরে থাকে প্রতিভার সেই সমন্বয়ী শক্তি যা সব কিছু বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তের মধ্যে ঐক্য আনতে পারে। সুবোধ ঘোষের সেই কবি প্রতিভার রহস্যময়ী শক্তি মনের অতলে ঢাকা পড়ে ছিল। জীবনের নানা বাস্তব সংকটে যতই তিনি পড়েছেন, যতই নানা সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন, ততই তাঁর মনের অতলে ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠেছে অন্য এক সৃজনশীলতার শক্তিতে দেদীপ্যমান জগৎ, সেই জগৎই তাঁর সৃষ্টির রহস্যময় জগৎ। হঠাৎ বন্ধুদের সঙ্গে কথায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তিনি লিখে ফেললেন একটি গল্প কিন্তু একটিমাত্র গল্প নয়। একটিমাত্র লেখা গল্পও বিখ্যাত হতে পারে। তবে একজন লেখকের অপ্রস্তুতভাবে রচিত কোনো গল্পে কিন্তু এমন নিত্য প্রজননশীল শক্তির ঠিকানা থাকে না।

> সেদিন আমার মনের বিস্ময়ের মধ্যে যে প্রশ্ন ছিল, আমার গল্প লেখার এই ইতিবৃত্ত পাঠ করে অনেকের মনে সেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কোন ব্যক্তির আকস্মিক কৃতিত্বের ব্যাপারটা কি বিনা চেষ্টার একটা ম্যাজিক ? সেদিন যে বাস্তব সত্যতার নিয়মটাকে স্পষ্ট করে ধরতে ও বুঝতে পারি নি, আজ সেটা খুব স্পষ্ট করে ধরতে ও বুঝতে পেরেছি বলেই বলতে পারি-না, আমার গল্প লেখার কৃতিত্বটা বিশুদ্ধ আকস্মিকতার একটা ইন্দ্রজালের জাল নয়। ভাবনা কল্পনা ও অনুভবের মধ্যে জীবন-বৈচিত্র্যের যে ছবি আগেই রূপান্তিত

হয়েছিল, তারই প্রতিচ্ছবি একদিন গল্পরূপে বিমূর্ত হয়েছিল।[৩৪]

এখানে লেখক বলেছেন লিখিত ভাবে না হলেও মনের ভিতরে ভিতরে একটা প্রস্তুতি যেন ছিলো। এই প্রসঙ্গে তিনি তার সাহিত্যের অন্তধর্মের রূপ দেখিয়ে দিচ্ছেন একটি দৃষ্টান্তে —

> প্রসঙ্গত আর একটি ঘটনার খুব ছোট একটি ইতিবৃত্ত স্মরণ করতে পারি, সেটা আমার প্রথম গল্প লেখার দু'তিন মাস আগের একটি অভিজ্ঞতার। আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগের একজন কর্মী হয়ে কাজ করতে গিয়ে বহুজনের প্রেরিত গল্পের ফাইল হাতড়ে একটি যোগ্য গল্প বাছতে হতো। যে সব লেখকের কম-বেশি নাম-ডাক ছিল, শুধু তাদের লেখা নয়, অখ্যাত লেখকের গল্পকে আমার বুদ্ধিবিচার অনুযায়ী মাজা-ঘষা ও ওলট-পালট করে, এমন কি গল্পের মধ্যে নতুন বর্ণনা ও নতুন সংলাপও যুক্ত করে দিতাম। এই রকম কয়েকটি গল্প প্রকাশিত করবার পর লেখকের ধন্যবাদ এবং পাঠকজনের প্রশংসার চিঠিও এসেছিল। লেখকের ধন্যবাদের চিঠিতে মন্তব্য থাকতো ঃ আপনারা আমার লেখা গল্পটির চমৎকার সংশোধন করেছেন। পাঠকজনের প্রশংসা ও চিঠিতে মন্তব্য থাকতো ঃ এই রবিবারে আনন্দবাজারে প্রকাশিত গল্পটি খুবই সুন্দর হয়েছে। এইরকম আরো গল্প ছাপুন। ব্যাপার দেখে আমার মনে একটি দুঃসাহসিক বাসনার প্রশ্ন কয়েকবার ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করলে ও চেষ্টা করলে আমিও কি একটা আস্ত ভাল গল্প লিখে ফেলতে পারি না? বাস্ ওই পর্যন্ত, প্রশ্নটা এর বেশি কোন মানসিক চঞ্চলতা সৃষ্টি করতে পারেনি। অনামী বন্ধুদের তাগিদে বাধ্য না হবার আগে আমি কোন গল্প লিখতে চেষ্টা করিনি।[৩৫]

নিজের গল্প লেখার প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন কবি প্রতিভার আশ্চর্য শক্তির কথা।

> কবি বলেছেন – ছিন্ন তুষারের প্রায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়। এটা কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মনঃপূত ধারণার কথা নয়। বাল্যবাঞ্ছার আবেদন ব্যক্তির অন্তশ্চেতনায় সঞ্চিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির কল্পনা ভাবনা ও অনুভবের স্বভাব তৈরী করে দেবার ব্যাপারে বাল্যবাঞ্ছারও হাত থাকে। কবি কালিদাস প্রাক্তন জন্মবিদ্যার কথা বলেছেন। পূর্বজন্মের অধিগত বিদ্যা পরজন্মে ব্যক্তির জীবনে সঞ্চারিত হয়ে সহজ প্রতিভা সৃষ্টি করে কি না, সেটা নিগূঢ় এক বিবাদীয় দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্ন। জন্মান্তরবাদও বাদ-প্রতিবাদের সংঘাতে অভিভূত একটি তত্ত্ব। এই প্রশ্নের জবাবে আমার বিশ্বাস ও ধারণার কথার মধ্যে হ্যাঁ কিংবা না দু'য়ের কোনটিই নেই। আমার বিশ্বাস এই যে, শুধু বাল্যবাঞ্ছা নয়, কৈশোর ও যৌবনেরও ভাবসঞ্চয় ব্যক্তির চিন্তার সৃষ্টিশীল প্রকৃতি নির্মাণ করে। এটা কবি, কলা-শিল্পী ও কথা-শিল্পীদের সম্পর্কে আরো বেশি প্রযোজ্য একটি সত্য।[৩৬]

চার

সুবোধ ঘোষ তখন আনন্দবাজারে সদ্যনিযুক্ত এক স্বল্প বেতনের কর্মী। বেতনের যা বহর ছিল তাতে আর যাই হোক্ কোন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার কাছে সুপাত্র হিসেবে বিবেচিত হবার সুযোগ ছিল না। তার শিক্ষাগত যোগ্যতাও প্রাক্-স্নাতক পর্যায়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। পিতৃপরিচয় এবং পারিবারিক ঐতিহ্যও

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় কিছু ছিল না। এই সময় পূর্ণিয়ার জেলের জেলার মুকুন্দবিহারী বসুর প্রথমা কন্যা মুকুলরানীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ম্যাট্রিক উত্তীর্ণা মুকুলরাণীও কলেজের পড়া সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। তবে শিক্ষায় তাঁর এই অসম্পূর্ণতা আর্থিক অনটনের জন্য নয়; সরকারী চাকুরে বাবার ঘনঘন বদলীর জন্য। মুকুলরানী ছিলেন যথেষ্ট সাহিত্যানুরাগী। আঁকতে এবং কবিতা লিখতেও ভালোবাসতেন তিনি। সুবোধ ঘোষের বিয়ের অনুষ্ঠানে কোন আতিশয্য ছিল না, বরং তা কিছুটা বর্ণহীনই ছিল বলা যেতে পারে। পুত্র উত্তম ঘোষ তাঁর যে জীবনী রচনা করেছেন তার থেকে তাঁদের পরবর্তী সংসার জীবন সম্বন্ধে দু-একটি তথ্য পাওয়া যায়। যেমন স্বামীর কাছে কোন সখ-সাধের কিছু তিনি চান নি। নিজের একটি বাড়ি চেয়েছিলেন। 'তোমার যদি সুদিন আসে, তেমন ক্ষমতা যদি ভগবান দেন... তবে আমাকে একটা বাড়ি করে দিও। ছোট্ট একটা নিজেদের বাড়ি।'[৩৭] এ থেকে বোঝা যায় মুকুলরাণী স্বামীকে অন্তত কোনভাবে অভাবের কথা বলে বিব্রত রাখেননি। উত্তম ঘোষেরই দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় মুকুলরাণীর পিতৃপরিচয়ের সম্পন্নতার বিপরীত পরিবেশে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে মানিয়ে চলতে একটাই সমস্যা হচ্ছিল, আর সেট হল অতিসামান্য কারণেও তাকে 'বিস্তর বকুনি'[৩৮] সহ্য করতে হতো। তাছাড়া স্বামীর অসহিষ্ণু আচরণও যে তাঁকে নীরবে সইতে হত, অন্তত সেই অসহিষ্ণুতা তিনি নীরবে সহ্য করুন এই ছিল স্বামীর ইচ্ছা – সে কথাও উত্তম ঘোষের লেখা থেকে বেরিয়ে আসে।

> অসহিষ্ণু স্বামীর কোন আরচণে ক্ষুব্ধ মুকুলরাণী বোধহয় একবার অভিমানসহ সত্যাগ্রহ টাইপের কিছু একটা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। মৌনতা ও অনশন ছিল সেই প্রতিবাদের প্রকাশ। স্বামী কটাক্ষ করতেন—'এই জেলারি মেজাজটা শোধরাতে হবে।[৩৯]

এতো বেশ স্পষ্ট করেই সুবোধ ঘোষের তাঁর স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিয়ে দেয়। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ যে কোন অসহিষ্ণুতা দেখাতেই পারে এবং স্ত্রীর তাতে নীরব প্রতিবাদ জানানোর উপায়ও নেই, কেননা তাহলেই পিতৃ-সম্পর্ক উল্লেখ করে স্বামী স্ত্রীকে খোঁটা দেবেন। বস্তুত এসব কথা বুঝিয়ে দেয় পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধারে অন্তত সমাজের অগণী বুদ্ধিজীবী মানুষেরও সামাজিক অবস্থান ঠিক কোথায়! উত্তম ঘোষ আবার লিখেছেন 'আমরা কিন্তু আমাদের জীবনে জেলারের কন্যার 'জেলারি' মেজাজ কিছু দেখিনি।'[৪০] স্বামীর এই বকুনি নীরবে সহ্য করে স্ত্রীর প্রতিবাদের ভাষার একটাই প্রকাশ উত্তম বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি স্বামীকে কখনো কখনো বেদনার্ত হয়ে বলতেন 'পরের ছেলে।'[৪১] পরের ছেলের আচরণে তিনি সম্ভবত ক্ষুব্ধ হয়েই একবার ছ'মাস বাপের বাড়িতে গিয়ে ছিলেন। আর স্বামীর কাছে যেটা তিনি বিশেষ করে পেয়েছেন উত্তমের উল্লেখে তা হলো 'নিজের লেখা একমাত্র মাকেই পড়ে শোনাতেন তিনি। রাত জেগে শুনতে হত।'[৪২] এটাই তার বিশেষ অধিকার! উত্তমের উক্তিতে 'সুবোধ ঘোষ নিজের সাহিত্য রচনার প্রথম আস্বাদনের অধিকার দিয়েছিলেন স্ত্রীকে'[৪৩]—আর এর পাশাপাশি একই বাক্যে তাঁর মন্তব্য 'যাকে দিনে অন্তত একবার বকুনি না দিয়ে তিনি কখনো ঘুমিয়েছেন বলে মনে পড়ে না।'[৪৪] এই সংযোজনটি খুব চমৎকার। মুকুলরাণীর প্রতিক্রিয়াটি শোনা যাক।

> আমার স্বামীর সমস্ত লেখার প্রথম পাঠিকা আমি। লেখবার আগে অনেক সময় কি নিয়ে লিখবেন সে পরিকল্পনার কথাও আমাকে বলে নিতেন। লেখা শুনে কতবার বলেছি—এখানটা ভাল লাগছে না আমার। রাগ করেন নি কোনদিন, কেটে অন্যভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন।[৪৫]

কলকাতার ২৭/২/৪বি কাঁকুলিয়া রোডের বাড়িতেই সুবোধ ঘোষের সংসার জীবনের শুরু। তাঁর তিন ছেলে — উত্তম, সত্তম, গৌতম এবং এক মেয়ে পরমা। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রায় গোটা জীবন ধরেই পাঞ্জা লড়েছেন সুবোধ ঘোষ। স্ত্রী মুকুলরাণীর কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং ঘরোয়া মানসিকতা সুবোধ ঘোষকে যে নির্বিঘ্নে সাহিত্যচর্চার সুযোগ করে দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুকুলরাণী যেন যে কোন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেবার জন্য সংসারে এসেছিলেন। সুবোধবাবু নিজেও স্ত্রীর এই সহনশীলতায় বিস্মিত হতেন। বেশ কষ্ট করেই একসময় তাঁকে সংসার চালাতে হত। তা সত্ত্বেও তিনি মানিয়েই চলতেন। মাঝে মাঝে মাসের শেষদিকে এমনকি কিছু ধারও করতে হত। তবে এ সব নিয়ে তিনি কোনো অনুযোগ করেননি। আমরা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করি সুবোধ ঘোষের চরিত্রেও। তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে রাশভারী এবং অহঙ্কারী মনে হত। মধ্যবিত্তের মানসবিশ্লেষণে সুনিপুণ এই কথাসাহিত্যিকের নিজের মানসবিশ্লেষণ আদৌ সহজ ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন স্বল্পবাক্ এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলতেন না। ধুতি, পাঞ্জাবী আর পাম্প-সু পরে গট্‌গট্ করে হেঁটে আনন্দবাজার অফিসে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে বসতেন।

> ওঁর ঘরের টেবিলে কিছু থাকত না। একেবারে ফাঁকা। এসেই সিগারেট ধরাতেন। নীরেনদা-নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শম্ভুদা-শম্ভুদাস চ্যাটার্জী মাঝে মাঝে ওঁর ঘরে যেতেন। নিচু গলায় কিছু গমগমে গলায় কথাবার্তা বলতেন। দু'একটা সিগারেট খেতেন এবং বেশির ভাগ সময়ই চুপচাপ একা বসে থাকতেন। তারপর এক ফাঁকে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতেন বা বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে এলে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠিয়ে দিতেন। তারপর, সন্ধে সাড়ে ছ'টা সাতটা নাগাদ সোজা বাড়ি।[৪৬]

তবে সুবোধ ঘোষের এই স্বেচ্ছা একাকীত্বকে তাঁর অহঙ্কার ভাবলে ভুল করা হবে। কারণ তাঁর সমসাময়িক বিভিন্ন সাহিত্যিকদের লেখায় দেখা যায় সুবোধবাবুর এই আচরণ ছিল একান্তই বাহ্যিক। যাঁরা তাঁর একটু সান্নিধ্য পেয়েছেন তাঁরাই তাঁর প্রসারিত হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। বিমল মিত্র তাঁর স্মৃতচারণে বলেছেন —

> মনে আছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একবার আমাদের সব লেখকদের নিয়ে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের পরিকল্পনাগুলি দেখাবার আয়োজন করেছিলেন। আমরা বন্ধুবান্ধবরা সবাই গিয়েছিলাম। আমরা চারজন একই কামরায় ছিলাম — আমি, সাগরময় ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং সুবোধ ঘোষ।
>
> পরপর তিন রাত আমরা জেগে কাটিয়েছি। সুবোধ ঘোষের গল্পের আকর্ষণেই আমাদের চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গিয়েছিল। সে রাতগুলোর কথা জীবনে কখনো ভুলব না।
>
> শুধু কি তাই ? আমাদের লেখক বন্ধু প্রভাতদেব সরকারের ইচ্ছে ছিল যে আমরা সবাই তার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে একরাত কাটিয়ে আসি। সেখানে তাদের পুকুরের মাছ ক্ষেতের চালের ভাত খেয়ে আসি। তাই যাওয়া হলো। সেখানেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।
>
> আরও বহু কথা মনে পড়ে। সাহিত্যিক সুশীল রায় তার জন্মদিনে প্রতিবার আমাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। সেখানে একবার খাওয়ার পর সুবোধবাবু বললেন, — ঐ দেখুন মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে, চলুন বহুদিন বাদে একবার মাঠে নামি। ধুতি মালকোচা করে পরে সবাই পাড়ার ছেলেদের সাথে ফুটবল

খেললাম, উপভোগও করলাম।[৪৭]

তবুও সাহিত্য সমাজে সুবোধ ঘোষের একটা বদনাম বরাবরই ছিল – তিনি দাম্ভিক। সুবোধ ঘোষ তাঁর চরিত্রের এই মূল্যায়ন সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। সেদিনের আলোছায়ায় নিজের চরিত্রের এই ধর্ম সম্পর্কে লেখকের বিশ্লেষণ —

> অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য একদিন বলেছিলেন—আপনার দাম্ভিক বলে দুর্নাম আছে। থাকতে পারে, সেদিন যেমন ছিল আজও বোধহয় তেমনই আছে। ঝলমলে আসরের মধ্যে প্রবেশ না করে একপাশে একটু আবছায়ার মধ্যে আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, কিংবা ভিড়ের চক্র দেখে দূরে সরে থাকা যদিও বস্তুত একপ্রকারের নিরীহ নির্লেপ তবু সেটা দম্ভ বলে অপবাদিত হয়ে থাকে।[৪৮]

এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান থেকে মানুষের পছন্দের সামাজিকতা বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই তিক্ততা তাঁর মনকেও কিঞ্চিৎ আহত করেছে।

> শুনেছিলাম, যে ব্যক্তি কোন দলে থাকে না, যে ব্যক্তি কোন সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থের পক্ষভুক্ত নয় তাকে সকলেই পছন্দ করে। আমার অভিজ্ঞতার যে-কথা আজও স্মৃতির ঘরে একটি অদ্ভুত ও অভাবিত বিস্ময়ের কলরবের মতো বাজে, সেটা এই যে, এহেন দলহীন ও অপক্ষভুক্ত ব্যক্তিকে সবাই অপছন্দ করে, তার সম্পর্কে কারও কোন মমতার কর্তব্য নেই, বরং তার সম্পর্কে যথেচ্ছ অপবাদ রটনা করাই একটা লোকাচার। এ ধরনের লৌকিক অমান্যতার অপঘাতে আমার সাহিত্যিক-জীবনের শান্তি মাঝে মাঝে ব্যথিত হলেও বিচলিত হয়নি। শুধু বিস্মিত হয়েছি কিন্তু বিদ্বিষ্ট হতে পারিনি।[৪৯]

প্রকৃতপক্ষে সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপ, স্বভাবজাত গাম্ভীর্য, অগাধ পান্ডিত্য এবং পান্ডিত্যজাত অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের জন্যই প্রথম দর্শনে বা প্রথম পরিচয়ে সুবোধ ঘোষকে দাম্ভিক বলে ধরে নিতেন অনেকেই। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দীর্ঘদিন সুবোধ ঘোষের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করেছেন, অনুজপ্রতিম হিসেবে। সুবোধ ঘোষের স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছেন —

> লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি, প্রথম দর্শনে আমারও তাঁকে দাম্ভিক বলেই মনে হয়েছিল। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। সদ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি, বিভিন্ন কাগজে লেখা পাঠাই, সঙ্গে ডাকটিকিট থাকে, ফলে – ভবিষ্যতে আপনার সহযোগিতা কামনা করি – মুদ্রিত এই দম্পাদকীয় মন্তব্য সহ চটপঠ সে সব লেখা ফেরত পেতে কোনও অসুবিধে হয় না। দেশ-এও একটা লেখা পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু ফেরত পাইনি। তারই খোঁজ নিতে একদিন বর্মন ষ্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। 'দেশ'-এর সম্পাদকীয় দপ্তরের জন্য কোনও আলাদা ঘর তখন ছিল না। একই ঘরের মধ্যে একাধিক দফতরের চেয়ার টেবিল। তারই একটি চেয়ারে বসে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের অত্যন্ত রূপবান এক যুবাপুরুষ চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরই কাছে গিয়ে লেখার খোঁজ চাই। উত্তরে তিনি একটিও বাক্যব্যয় না-করে গম্ভীর মুখে আর একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন।
>
> পরে জানতে পারি, তিনি সুবোধ ঘোষ, তাঁর বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ নয়, একতিরিশ।

আরো পরে বুঝতে পারি, গাম্ভীর্য তাঁর বর্মমাত্র, এবং সেই বর্মের আড়ালে যিনি আত্মগোপন করে আছেন, তাঁর মতো মমতাময় মানুষ সহসা চোখে পড়ে না।[৫০]

সুবোধ ঘোষের গল্প এবং উপন্যাস বিস্তৃতভাবে আলোচনার সময় লক্ষ করা যায় যে তিনি বাঙালী হয়েও বাংলার গন্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর কথাসাহিত্যে চরিত্রগুলো উঠে এসেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। পূর্বাপর এক অদ্ভুত ভারতীয়তাবোধ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সাহিত্যের পাতায় পাতায়। কবি নীরেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।

সুবোধদা ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আদর্শে বিশ্বাসী এবং উদার মানবতন্ত্রে আস্থাশীল একজন বাঙালী। অর্থাৎ তিনি 'নিতান্ত বাঙালী' ছিলেন না। চন্ডীদাসের পদাবলী ও তুলসীর দোঁহা, দুই-ই তাঁকে সমান আকর্ষণ করত। প্রায়ই বলতেন – বাংলার মাটিতে জন্মেছিস বটে, কিন্তু তোর দেশটার নাম যে ভারতবর্ষ, সেটা কখনও ভুলবি না।[৫১]

সুবোধ ঘোষের বাইরের গরুগম্ভীর আচরণ, তাঁর ভেতরের বন্ধনমুক্তি প্রয়াসী অন্তরকে সর্বদা শাসনে রাখতে পারত না। সেই মন ইচ্ছেমত মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতো এবং গাম্ভীর্যের খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে আসতেন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এক অন্য সুবোধ ঘোষ। নীরেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায় —

একবারের কথা বলি। দিন পনেরো-কুড়ির ছুটি নিয়ে সুবোধদার সঙ্গে সেবারে আমি শিলং যাচ্ছিলুম। দার্জিলিং মেলে রওনা হয়ে শিলিগুড়িতে ট্রেন পালটে গৌহাটি যাব, তারপর সেখান থেকে বাসে করে শিলং। ফারাক্কার ব্রিজ হওয়ার অনেক আগের ঘটনা। তখনকার দিনে ভোরবেলায় সকরিগলি ঘাটে স্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে মনিহারিঘাটে নেমে আবার ট্রেনে উঠতে হত। তা গঙ্গা পেরিয়ে আবার চ্টপট্ রেলগাড়িতে উঠে তো দিব্যি শতরঞ্চি বিছিয়ে আমি জায়গা দখল করে বসেছি, আর মনে মনে ভাবছি যে, যাক শিলিগুড়ি পর্যন্ত এখন নিশ্চিন্তি। কিন্তু, হা হতোস্মি, ট্রেন গিয়ে কাটিহারে পৌঁছুতেই সুবোধদা বললেন, শতরঞ্চি গুটিয়ে নে, আমরা এখানে নামব।

কেন নামব কিছু বুঝতে পারছি না। ইস্টিশানে নেমে, কাঁধে শতরঞ্চি ও হাতে সুটকেশ ঝুলিয়ে দুজনে যখন উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করেছি, তখনও আমি বুঝতে পারিনি যে, মাঝপথে এমন হুট্ করে আমাদের নামবার দরকার হলো কেন।

বুঝতে পারলুম ঠাঠা-রোদ্দুরের মধ্যে মাইল দেড়েক পথ হাঁটবার পর। রেললাইনের ধারে মস্ত একটা মাঠ। তার একধারে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। সেই গাছের তলায় গোটা কয়েক খাটিয়া পাতা। দোকানিকে ডেকে সুবোধদা কিছু পুরী ভাজাবার ব্যবস্থা করলেন। তারপরে একটা খাটিয়ায় গা ঢেলে দিয়ে বললেন — কী জানিস, ট্রেন থেকে এই জায়গাটা দেখে বড় ভাল লেগে গিয়েছিল। তা আরও তো খাটিয়া রয়েছে। তুইও বরং শুয়ে পড়।[৫২]

সাহিত্য জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর ক'জন বন্ধু ছিলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্মথনাথ সান্যাল, অরুন মিত্র, পুলকেশ দে সরকার, বিজন ভট্টাচার্য এবং সাগরময় ঘোষ। এঁরা প্রকৃত অর্থেই সুবোধ ঘোষের বন্ধু ছিলেন। এই ক'জনই সুবোধ ঘোষকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করে তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে অবাধ

বিচরণের আত্মবিশ্বাস যোগান। তাঁরা সুবোধ ঘোষকে, অযান্ত্রিক রচনার পর হঠাৎ আবিষ্কৃত সাহিত্য প্রাঙ্গনে মনসংযোগ করতে একরকম বাধ্য করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে সসম্মান প্রবেশাধিকার পেয়েও পালিয়ে যাবার জন্য সুবোধ ঘোষের প্রাথমিক সংকল্পকে রুখে দিয়েছিলেন তাঁরা। সুবোধ ঘোষ স্বীকার করেছেন সে কথা —

> আমার গল্প লেখার সুখ্যাতিতে আমি আর এমন কি খুশী হয়েছিলাম। আমার চেয়ে শতগুন বেশি হয়েছিলেন তাঁরা আমার ঐ ছয়, সাতজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার গল্পের সুখ্যাতি যেন তাঁদেরই একটি প্রিয় আকাঙ্ক্ষার সফল কৃতিত্বের পরিণাম।[৫৩]

যাঁরা কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মত সুবোধ ঘোষের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন তাঁরাই এই কথাসাহিত্যিকের উদার এবং সংবেদনশীল হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছিলেন। কিন্তু এই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরা সংখ্যায় ছিলেন খুবই কম। ফলে কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ, তাঁর কর্মক্ষেত্রে, সাহিত্য ক্ষেত্রে এমনকি কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়াতেও খুব একটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর বাইরের গাম্ভীর্য, অগাধ পান্ডিত্য, এবং মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যের ব্যবহারের জন্য তাঁর চারপাশের অনেকই তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। ফলে সুবোধ ঘোষ তাঁর কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে যতটা শ্রদ্ধা লাভ করেছেন ততটা ভালবাসা পান নি। তাঁর পরিচিতজনেরা যেন একটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে মাথা ঝুঁকিয়েছেন, আলিঙ্গনের দুঃসাহস দেখান নি। তাই জীবনের শেষপর্বে, অসুস্থ সুবোধ ঘোষকে অনেকটা নিঃসঙ্গ বান্ধবহীন অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল। উত্তমের লেখা থেকে জানতে পারি সুবোধ ঘোষের বন্ধুর সংখ্যা বেশি ছিল না। শেষজীবনে, এ জন্য ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন।

> জীবনের শেষ দুটি বছর সুবোধ ঘোষ প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন। এমনকি তাঁর শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসার জন্যও বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে আসতে দেখা যায়নি। এ জন্য তিনি অন্তরে নিশ্চয়ই আহত ছিলেন, যদিও স্বভাবগত কারণেই তার বিশেষ কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। তবে পরিবার পরিজনদের সঙ্গে কথাবার্তায় এক আধবার বান্ধবহীনতার ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে বৈকি।
>
> নিঃসঙ্গ অবস্থায় কষ্ট পাচ্ছেন দেখে পুত্রবধূ কৃষ্ণা সুবোধ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— ''কই বাবা, আপনার অসুখ জেনেও তো আপনার কোন বন্ধু-বান্ধব একবারটি আসেন না। এঁরা এলে আপনার সময়টা একটু ভাল কাটত মনে হয়।'' একরাশ ক্ষোভ ঝরে পড়েছিল বিষন্ন সুবোধ ঘোষের কন্ঠে— বাজে কথা ব'লো না। আমার আবার বন্ধু-বান্ধব কোথায় যে আসবে ?[৫৪]

পাঁচ

সুবোধ ঘোষকে জানতে হলে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অবশ্য প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, কথাসাহিত্যে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট এবং কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সুবোধ ঘোষের রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে মতপার্থক্যও আছে। তবে সুবোধ ঘোষের রচনা এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে যে সাহিত্য জীবনের শুরুতেই তিনি কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পরে তাঁর বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটে। তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি, তাঁর অহিংস নীতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়েন এবং কলম হাতেই কংগ্রেসের পক্ষে কাজ শুরু করে দেন।

সুবোধ ঘোষের রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে দীপেন্দু চক্রবর্তী লিখেছেন —

> সুবোধ ঘোষ একদা ছিলেন কমিউনিষ্টদের আপনজন। তাঁর গল্পকার হবার গল্পটিতে কমিউনিষ্টদের একটা ভূমিকা ছিল। কতিপয় বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের একটি সাহিত্য পাঠের আড্ডায় তিনি বাধ্য হন একটি গল্প লিখে পাঠ করতে সেটিই হলো বিখ্যাত 'অযান্ত্রিক' গল্প, যা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়। ...সুবোধ ঘোষের দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল' বার হয় যে পত্রিকায় সেই 'অগ্রনী' ছিল কমিউনিষ্টদের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পত্রিকা।
>
> ...ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিরা, যাঁরা GOD THAT FAILED এর লেখক, সুবোধ ঘোষের চেয়েও অনেক বেশী কমিউনিজম সম্বন্ধে অনুরক্ত ছিলেন প্রথম দিকে, তাই তাদের মোহভঙ্গের চীৎকারটাও একটু বেশী মাত্রায় ঘটেছিল। সুবোধ ঘোষের সঙ্গে কমিউনিষ্টদের ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্বেও তিনি কমিউনিজম সম্বন্ধে সেই উৎসাহ কখনই দেখান নি যাতে তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থান সবার পক্ষেই কৌতুককর হতে পারে। স্বল্পকালীন নৈকট্যে কমিউনিষ্টদের প্রতি যে অনুরাগের জন্ম তাই অভিজ্ঞতার আঘাতে অশ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয়। সুবোধ ঘোষের এই দিক্ পরিবর্তনের ইতিহাসটায় তেমন জটিলতা আছে বলে মনে হয় না। ধনঞ্জয় দাস তার মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক-র ভূমিকায় (প্রথম খন্ড) জানাচ্ছেন —সুবোধ ঘোষকে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে ঠেলে দেওয়ার জন্য মূলত দায়ী ছিল নাকি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কিছু অসতর্ক উক্তি এবং অমিত্র সুলভ আচরণ। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য অন্তত আমাকে সেই কথাই বলেছিলেন।[৫৫]

সুবোধ ঘোষ ঠিক কি কারণে কমিউনিষ্টদের প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন এবং তাঁর সেই রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিবর্তনের পেছনে বিশেষ কারো কোন ভূমিকা ছিল কিনা তা এই মুহূর্তে আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু মতাদর্শগত কারণেই যে তিনি কমিউনিজমের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে, মনে প্রাণে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এ কথা সর্বাংশে সত্য। শুধু তাই নয়। পরবর্তীকালে সুবোধ ঘোষ কমিউনিষ্ট এবং কমিউনিজমের কঠোর সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। সুধী প্রধানের বক্তব্যে এর সমর্থন মেলে।

> সুবোধবাবুর সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদের কারণ রাজনৈতিক। 'জনযুদ্ধ' নীতি গ্রহণের পর বুদ্ধিজীবীদের একাংশ আমাদের বিরুদ্ধে যায়। সুবোধবাবু প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেছেন বলে আমি জানি না। কিন্তু ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের পাল্টা 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ' যখন প্রতিষ্ঠিত হ'ল সেই সংগঠনে সুবোধবাবু প্রয়াত শহীদ শচীন মিত্রের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি'তে কমিউনিষ্ট পার্টি ও 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী সঙ্ঘ' সম্পর্কে যে সব নিন্দনীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা আমি এ প্রবন্ধে উল্লেখ করতে চাই না। কারণ আমি মনে করি তাঁর মত সাহিত্যিকের পক্ষে এটি ক্রোধান্ধ ভ্রষ্টাচার।[৫৬]

এ কথা ঠিক, সুবোধ ঘোষ কখনও প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন নি। তবে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির প্রতি আস্থা নিয়েই তিনি কংগ্রেসের পক্ষে সতঃস্ফুর্ত হয়ে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ১৯৪৪ সালের ১২ই নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ। এই সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুবোধ ঘোষ যুগ্ম সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন। এই সাহিত্য সংঘের পক্ষে এবং সুবোধ ঘোষের

নেতৃত্বে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে ১৯৪৫ এর ১৩ই এপ্রিল রংমহলে অনুষ্ঠিত হ'ল, গীতি-নৃত্যনাট্য 'অভ্যুদয়।' জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণায় এই গীতি-নৃত্যনাট্য দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল।

সুবোধ ঘোষকে জাতীয়তাবাদী লেখক আখ্যা দিয়ে প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা এবং শিক্ষাবিদ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র লিখেছেন —

> সুবোধ ঘোষ মহাশয় শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক। তাঁর কথায়, কর্মে, রচনায়, আচরণে গভীর দেশপ্রেম উৎসারিত হত। সেই দেশপ্রেমের ভিত্তি ছিল, নিবিড় মানবপ্রেম যা সংকীর্ণতামুক্ত এক দরদী মনের পরিচয় দিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর রচনাকে বিশ্লেষণ করা চলে। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও জাতীয় কংগ্রেসের ভাবধারা ও কর্ম প্রচেষ্টাকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্যে তিনি এই সংস্থাকে সফলভাবে পরিচালিত করেছিলেন তার প্রথম কয়েক বৎসর ধরে। সাহিত্যিক শুধু ভাবজগতে বিহার করবে না, সাধারণ মানুষের সুখে দঃখে কর্মপ্রচেষ্টায় তার সহকর্মী হবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাই তিনি সাহিত্যকার ছিলেন, আবার গঠনকর্মীও ছিলেন, এটাই ছিল তাঁর কর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য।[৫৭]

মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও আদর্শ নিয়ে সুবোধ ঘোষ রচনা করলেন এক প্রামাণ্য গ্রন্থ—অমৃতপথযাত্রী। সত্য ও অহিংস পন্থায় পূর্ণ স্বরাজ রচনা করার জন্য মহাত্মা গান্ধী সমাজ ও সভ্যতাকে যে বিপ্লবের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন, তার প্রতি সুবোধ ঘোষের অখন্ড বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। অমৃতপথযাত্রীতে গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং গান্ধীবাদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

> এই বিপ্লবের রূপ শান্ত উৎসবের মত, শিল্পীর ছন্দোবদ্ধ কর্মসাধনার মত। যে ভিত্তির উপর কল্যাণের রূপ স্থায়ী হয়, তারই প্রতিষ্ঠা। এবং যে ভিত্তির উপর অকল্যাণ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, তারই অপসারণ। অল্পদিনের মধ্যেই পরিবর্তন, এরই নাম বিপ্লব। এ বিপ্লব শুধু আঘাত ও সংঘর্ষমূলক পন্থায় সিদ্ধ হবে, পাশ্চাত্যের ধারণার সীমা এই পর্যন্ত। মহাত্মা গান্ধী বৈপ্লবিক পন্থারই এক নতুন রূপ আবিষ্কার করেছেন-গঠনমূলক বিপ্লব। এ বিপ্লবে যে পরিবর্তন আসে সেটা ক্ষণিক আড়ম্বর নয়, সেটা চিরস্থায়ী। পাশ্চাত্যের প্রতিভায় ও চিন্তায় বিপ্লববাদের এই রূপ আবিষ্কৃত হতে পারেনি। অহিংসাকে যিনি ঐতিহাসিক শক্তিরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সেই মহাত্মার দ্বারাই এই অভিনব অথচ অত্যন্ত বাস্তব 'পরিবর্তন বিজ্ঞান' আবিষ্কৃত হয়েছে।[৫৮]

একদা 'কমিউনিষ্টদের আপনজন' সুবোধ ঘোষ ঠিক কি কারণে রাজনীতির বিপরীত মেরুতে গিয়ে গান্ধীবাদের ঘোরতর সমর্থক হয়ে উঠলেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক শিবিরে মতপার্থক্য আছে। তবে 'অমৃতপথযাত্রী' পাঠের পর একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, যে কারণেই সুবোধ ঘোষ তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিবর্তন করে থাকুন না কেন, গান্ধীবাদের প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পর্কে তিনি বিস্তর পড়াশুনো ও পর্যালোচনা করে, প্রতিটি বিষয় নিজের যুক্তি, বুদ্ধির কষ্টিপাথরে বিচার করেই গান্ধীবাদের সমর্থনে সরব হয়েছিলেন। দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে সুবোধ ঘোষের যুক্তি —

> বর্তমানে নানা দেশে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন যে পন্থায় ও যে দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত, তার মধ্যে একটা গলদ আছে। মালিকের বিরুদ্ধে লড়বার সময় সমাজের সম্পদকে ক্ষুন্ন করার চাপ না দিয়ে ট্রেড-ইউনিয়নবাদী শ্রমিক আত্মোন্নতির আর কোন পন্থা ভাবতে শেখেনি। গান্ধীজী তাঁর কৃষক ও শ্রমিক

> সংগঠনে যে অহিংস পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন, তার চেয়ে নীতিসঙ্গত ও বাস্তবোচিত পন্থা আর কিছু হতে পারে না। দ্বন্দ্ববাদ ও সংঘর্ষবাদের মধ্যে উত্তেজনা ও প্ররোচনা আছে, ভাবোচ্ছাস আছে কিন্তু বাস্তবোচিত সত্যতা নেই।[৫৯]

গান্ধীবাদে শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠার পর স্বাভাবিক কারণেই তাঁর কাছে কমিউনিষ্টদের মতাদর্শ সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে। কারণ একই মানুষের পক্ষে একসঙ্গে দুটি ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক মতাদর্শকে সক্রিয় সমর্থন জানানো সম্ভব নয়। রাজনৈতিক মেরু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের সিদ্ধান্ত এবং যুক্তি সঠিক ছিল কি না, তা নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে, বিতর্কও হতে পারে। তবে সুবোধ ঘোষ বিশেষ কোন কমিউনিষ্ট নেতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতির জন্য রাজনৈতিক মেরু পরিবর্তন করে গান্ধীবাদের প্রচার ও প্রসারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, এটা খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কারণ, সুবোধ ঘোষ এক সময় কংগ্রেসের সংস্পর্শ থেকেও নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কংগ্রেস দলের নীতি ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস দলের কর্মপদ্ধতির পার্থক্য তাঁকে আহত করে। সুবোধ ঘোষ পুরোপুরি ফিরে আসেন সাহিত্য এবং পারিবারিক জীবনে। ১৯৪৯ এ কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সাধারণ সভায় সুবোধ ঘোষ যুগ্ম সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি নেন। অনেক অনুরোধ উপরোধেও তিনি সংঘের কোন পদ আর গ্রহণ করেন নি। সুবোধ ঘোষের রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা, এবং কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছে যে তিনি যখন যে রাজনৈতিক আদর্শে আস্থা স্থাপন করেছেন, তাকে সত্য ভেবেই করেছেন। যেখানে সত্যতায় সন্দেহ হয়েছে, সেখান থেকে ফিরে এসেছেন। প্রথমদিকে কম্যুনিষ্ট বিরোধিতা করেছেন, শেষদিকে নীরবে কংগ্রেসের ভ্রষ্টাচার লক্ষ করে সরে দাঁড়িয়েছেন। রাজনীতির মধ্যে মূল্যবোধ খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন। রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সুবোধ ঘোষ কি শেষ জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাসে পুনর্বাসিত হয়েছিলেন ? পুনর্বাসনের প্রশ্ন উঠছে এ জন্য যে এই কথা সাহিত্যিক তাঁর যৌবনে ঈশ্বর বিশ্বাসকে 'একটা যুক্তিহীন প্রত্যয়'[৬০] ভেবে নিয়ে সন্তোষ লাভ করেছিলেন। পরিণত সুবোধ ঘোষ দিন শেষে ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর যৌবনের যুক্তিকে মেনে নিতে পারেন নি, বরং আহত হয়েছেন, আক্ষেপ করেছেন বারবার।

> ব্রহ্মোপাসনা ও হরিসংকীর্তন শুনতে অভ্যস্ত ছেলেবেলার জীবনে যে ঈশ্বরবিশ্বাস খুবই সহজ ও স্বাভাবিক একটি প্রাপ্তি হয়ে কাছে এসেছিল, সেই ঈশ্বরবিশ্বাসকে একটা যুক্তিহীন প্রত্যয় বলে ধারণা করে খুব খুশি হয়েছিল জীবনের যৌবনকাল। বিবেকানন্দ সাহিত্য অতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা নিয়ে পাঠ করে যে ঈশ্বর বিশ্বাস আবার অন্তরতর ভাবনায় বিমূর্ত হয়েছিল, তাও আবার নানা সন্দেহে ভঙ্গুর হয়ে শেষে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাসের এরকম সঙ্কট অথবা বিপর্যয়ের ঘটনা অন্য অনেকের জীবনেও দেখতে পেয়েছি। নানা মুনির নানা মতের তত্ত্ব থেকে শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সত্য বলে প্রমাণিত করার যুক্তি, আর মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করার যুক্তি, দুই-ই সমান ভারী। না, যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিনাস্তি প্রমাণ করা সম্ভব নয়। সংশয়াপন্ন মনটা দীর্ঘকাল এই সিদ্ধান্ত পুষে রেখেছিল যে যদি কোন অলৌকিক ঘটনা দেখতে পাই তবেই বুঝব যে, লৌকিক প্রত্যয়ের ওপারে সত্যিই কেউ একজন নিশ্চই আছেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার ইচ্ছার এই দাবিটা যেন নিজেদেরই অট্টহাসির ঠাট্টায় চূর্ণ হয়ে গেল।

ঠাট্টা করেছিল একটা ঘটনা। ঝড়ের হাওয়ায় যেমন বন্ধ কপাটের কড়া নেড়ে ঠাট্টা করে। বিখ্যাত দার্শনিক যেমন বলেছেন, আমার নতুন উপলব্ধির বিস্ময়টাও প্রায় তেমনই করে বলেছিল মিরাকেল কাকে বলে ? তোমার তুচ্ছতার ঠেলায় কেঁদে ফেলেও শিশুটি দুই হাত বাড়িয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে, আর অন্ধকারের পথে তোমার পায়ের কাছ থেকে সাপটা নিজেই সরে যায়—এইসব নিতান্ত লৌকিক ঘটনা কি বিস্ময় হিসাবে কম অলৌকিক ? ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, ভালবাসার আবেগ ওষ্ঠপুটের রক্তিমা আরও নিবিড় করে তোলে, এইসব নিতান্ত লৌকিক সত্যের রূপ দেখে কেউ মুগ্ধ হ'তে পারতো না, যদি এর মধ্যে অলৌকিক বিস্ময়ের প্রকাশ না থাকতো।[৬১]

ঈশ্বর-বিশ্বাসে পুনর্বাসিত হতে না পেরে সুবোধ ঘোষ শেষ জীবনে আক্ষেপ করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁর জীবনে ঠিক উল্টো ঘটনাটাই ঘটেছে। সুবোধ ঘোষ জীবনের বিভিন্ন পর্বে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করে, শেষ জীবনে রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন।

সাহিত্যিক জীবনের স্মৃতিকথার মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাসে পুনর্বাসিত হবার কথা কেন ? পাঠকজনের এই প্রশ্নের জবাবে আমার কথা এই যে, আমার সাহিত্যকর্মের সাধ আজ ঈশ্বর বিশ্বাসের নতুন প্রদীপের কাছে এসে নতুন আলোর অভিষেক খুঁজছে। তাই থমকে থাকতে হচ্ছে। যদি সেই অভিষেক পাই, তবেই রূপে গুণে ভাবে ও প্রকারে নতুন বলে বোধ হবে এমন গল্প ও উপন্যাস লিখতে পারবো নইলে পারবো না। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শক্তি ও আনন্দের সম্বল যে ঈশ্বর-বিশ্বাস, তার সুমহিম প্রেরণার অনুগত বিস্ময় ও বৈচিত্র্যের পরিচয় রূপায়িত করে এতদিন কেন অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখিনি নিজের সম্পর্কে এই অভিযোগ আজ একটি কষ্টকর আক্ষেপ হয়ে মনের ভিতর বাজে। গল্প ও উপন্যাস লেখার সাহিত্যিক কর্ম এক ধরণের রিচুয়াল তথা বিশ্বাসের তর্পণ বলে মনে হয়েছে। গল্প, উপন্যাস ও কবিতা জীবনের অভিজ্ঞাত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাময় বিশ্বাসের নৈবদ্য। কল্পনা করতে পারি, ঈশ্বর-বিশ্বাসের অনুগত প্রেরণার সৃষ্টি হয়ে আগামীকালের কান্তসাহিত্য ও রম্যকলা কী বিপুল আনন্দের নিবেদন সত্য করে তুলবে।[৬২]

ছয়

গল্প, উপন্যাস লিখে উপার্জনের পাওনা-গন্ডা বুঝে নেবার বিষয়ে সুবোধ ঘোষের বরাবরের অনীহা ছিল। সাহিত্য, তাঁর কাছে ছিল সৃষ্টির নেশা এবং পেশাও বটে। তবে তাঁর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে তাঁর পেশাদারিত্ব কখনো সৃষ্টি-নেশাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। পারেনি সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে। লেখার পরিবর্তে ন্যায্যভাবে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য কখনো তাঁকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি।

একজন নিয়মিত লেখকের প্রকাশনা সূত্রে বই পাড়ার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুবোধ ঘোষের কোন কালেই তা হয়নি। লেখার সঙ্গে প্রকাশনার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একজন

প্রথম শ্রেণীর লেখক হয়েও সুবোধ ঘোষ প্রকাশক এবং প্রকাশনা সম্পর্কে ছিলেন নির্লিপ্ত। কারণ, লেখক প্রকাশকের হৃদ্যতার মূল যে বিষয়— আর্থিক লেনদেন, সে সম্পর্কে সুবোধ ঘোষের মাত্রাতিরিক্ত ঔদাসীন্য ছিল।

প্রখ্যাত প্রকাশক বাদল বসু, সুবোধ ঘোষের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করে লিখেছেন —

> ...মনে পড়ে না সুবোধ ঘোষকে কোনদিন আমরা সেখানে (বই পাড়ায়) পেয়েছি, শুনেছি বইপাড়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন, আরেকজন লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী। তাঁকেও নাকি বই পাড়ায় বিশেষ দেখা যায়নি। —তবে তাঁর তরফে বইপত্রের ব্যাপারে তদারকি করতেন বা খোঁজখবর রাখতেন কলকাতা নিবাসী তাঁর ভাই। সুবোধ ঘোষের তরফে এভাবে কেউ কখনো নজরদার বা খবরদার ছিলেন বলে শুনিনি, দেখিও নি।
>
> এক কথায়, লেখক হয়েও তিনি প্রকাশনা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রচ্ছদশিল্পী হয়ত একবার গিয়ে মলাটের নক্সাটি দেখিয়ে নিয়ে এলেন-এই যা। টাকা পয়সা, বিক্রিবাটার বার্ষিক হিসেব-নিকেশের কাগজটুকু তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হত।[৬৩]

কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ার সঙ্গে সুবোধ ঘোষ যতটুক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখতেন তা প্রধাণত পরোপকারের জন্য, নতুবা জ্ঞানাণ্বেষী ছাত্রের মত অন্য লেখকের লেখা বিশেষ কোন বই খুঁজতে। নিজের লেখা বই-এর ছাপা বা বিক্রীর বিষয়ে খোঁজ নিতে তিনি কখনো বইপাড়ায় গিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। বাদল বসুর লেখায় এর সমর্থন মেলে —

> তবে হ্যাঁ, কখনো কোন উপলক্ষেই যে তিনি আমাকে কিছু বলেন নি এমন নয়। মনে পড়ে, একসময় কুন্ঠিত কোন অপরিচিত ব্যক্তি হয়তো ভাঁজ করা একটি চিঠি খাম থেকে বার করে আমার হাতে তুলে দিলেন। চিঠিটি আমাদের কাউকে লেখা নয়, লেখা সুবোধ ঘোষকেই। পত্র লেখক তার কন্যার বিয়েতে কিছু সাহায্য চান। কিংবা পুত্রের লেখাপড়া বা বই কেনা বাবদে কিছু। চিঠির এক কোনে আমাকে সম্বোধন করে সুবোধ ঘোষ জানাচ্ছেন, পত্রবাহককে যেন নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ দেওয়া হয়। আমরা তৎক্ষণাৎ সে আদেশ শিরোধার্য করে নিতাম।
>
> একবার নয়, অনেকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মনে ভেবেছি, আজব মানুষ বটে সুবোধ ঘোষ। এমন নিঃশব্দে পরোপকারের দৃষ্টান্ত বোধহয় কমই দেখা যায়। অনুমান করি, এইসব অনুগ্রহপ্রার্থীদের তখনই তিনি আমার কাছে পাঠাতেন, যখন তাঁর পকেটে যথেষ্ট নগদ অর্থ থাকত না। নিশ্চয় তিনি অনেককে বিদায় করেছেন অফিস থেকেই, এবং কখনো খালি হাতে নয়।
>
> বলেছি, সুবোধ ঘোষকে কখনও বই পাড়ায় দেখা যেত না। কথাটা পুরো ঠিক নয়। প্রকাশকের ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে না বেড়ালেও তিনি মাঝে মাঝে বইপাড়ায় হানা দিতেন। সেটা নিজের বই সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্য নয়, অন্যের লেখা বই কিনতে। শুনেছি, নানা কাগজে আলোচনা বা বিজ্ঞান পড়ে তাঁর যে সব বই কেনা দরকার বা পড়া দরকার বলে মনে করতেন, সেগুলোর নাম নোটবই-এ টুকে রাখতেন। তারপর তালিকা দীর্ঘ হয়ে গেলে একদিন বের হতেন কিনতে। গাড়ি বোঝাই বই নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরতেন।

পুরনো, দুষ্প্রাপ্য বই-এর প্রতি তাঁর ঝোকের কথা অনেকের মুখেই শুনেছি।[৬৪]

সুবোধ ঘোষের গল্পে উপন্যাসে লক্ষ করা যায় যে তিনি দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের ব্যথায় সমব্যথী ছিলেন। এই মানুষদের প্রতি তাঁর ছিল এক অদ্ভুত মমত্ববোধ। ব্যক্তিজীবনে বঞ্চিত মানুষের প্রতি সেই মমত্ব না থাকলে, সাহিত্যের পাতায় সেই মমত্বের প্রকাশ কখনো এত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে না, প্রকাশক বাদল বসুর স্মৃতিচারণে সুবোধ ঘোষের মানবিকতার প্রকাশ লক্ষ করার মত।

> একদিন তিনি আনন্দবাজারে তার ঘরে বসে লিখছেন। এমন সময় অফিসের একজন কর্মী ঘরে ঢুকে প্রণাম করল তাঁকে। সুবোধ ঘোষ বললেন-কী চাই ? কর্মীটি নিজের পরিচয় দিল। তার বাবা বহুদিন আগে আনন্দবাজারে লিখতেন। খুবই বিখ্যাত সেই নাম। সুবোধ ঘোষ চিনতেন তাঁকে। পরস্পরের মধ্যে ছিল শ্রদ্ধার সম্পর্ক।
>
> ছেলেটি একটি থলি থেকে দুখানি মোটা বই বের করে বলল – আপনি পুরোনো বই পছন্দ করেন, তাই নিয়ে এলুম। আমার বাবার লাইব্রেরীর বই। ভাবলুম বেচতেই যখন হবে, তখন আপনাকে প্রথম দেখাই।
>
> সুবোধ ঘোষ বই দুটি হাতে নিয়ে দেখলেন, তারপর পকেট থেকে টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে বললেন – এই নাও। ছেলেটি টাকা নিয়ে বলল – আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, এবার তাহলে যাই। সুবোধ ঘোষ বললেন – বইগুলো নিয়ে যাও, তোমার বাবার বই, আমি এভাবে কিনতে পারব না। লাইব্রেরীতেই রেখে দাও।[৬৫]

এই ছিলেন সুবোধ ঘোষ। সুবোধ ঘোষ সাহিত্যকে কখনো পণ্য হিসেবে দেখেন নি। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিতেন – কতটা মর্যাদার সঙ্গে সেই অর্থ প্রদান করা হচ্ছে – তার উপর। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন সুবোধ ঘোষ বিশ্বাস করতেন সাহিত্য এক উন্নত শিল্পকর্ম। সাহিত্যিককে তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য অর্থমূল্য দিতে হবে একজন শিল্পীর প্রাপ্য মর্যাদার সঙ্গেই। ব্যক্তিজীবনে উপযুক্ত মর্যাদার অভাবে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেছেন। এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী, কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের জীবনের দু-একটি ঘটনা থেকেই তাঁর এই বিশেষ আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তম ঘোষ তাঁর বড় বিস্ময় জাগে নামক পিতৃকথায় লিখেছেন—

> ১৯৬৪-৬৫ সালে বিশিষ্ট একজন চিত্র প্রযোজক সুবোধ ঘোষের 'জিয়াভরলি' উপন্যাসের চিত্র সত্ব কেনার জন্য আসেন। আলোচনা সুন্দরভাবেই এগোল। শেষপর্বে প্রযোজক প্রশ্ন করলেন 'আচ্ছা রাইটার সাহাব এই নভেলের জন্য আপনার ফীজ্ কত লাগবে ?' – সুবোধ ঘোষের চেহারায় বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরে জানা গেছে 'ফীজ্' শব্দটিতে তিনি আহত হয়েছিলেন। এই বিশেষ শব্দটি সাধারণত ঃ বিশেষ কিছু পেশা যেমন, চিকিৎসা, আইন ব্যবসায় ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। সুবোধ ঘোষের মতে 'ফীজ্' শব্দটিতে শিল্পীর প্রাপ্য মর্যাদার অভাব ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই প্রযোজককে বিদায় করলেন। বললেন – 'আমার এখন সম্পাদকীয় লেখার সময় হল। আপনারা বরং অন্য সময়ে আসবেন। প্রযোজক ভদ্রলোক বার করা চেক বই গুটিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে উঠে পড়লেন। অন্তত আট থেকে দশ হাজার টাকার ক্ষতি, কিন্তু, সুবোধ ঘোষ প্রতিক্রিয়াহীন, অচঞ্চল।[৬৬]

দশ বছর পর অন্য একটি ঘটনা। মহানায়ক উত্তমকুমার সুবোধ ঘোষের 'থির-বিজুরী' ও 'শ্মশান চাঁপা' গল্পদুটির চিত্রসত্ত্ব কিনতে চান। লেখককে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তমকুমার তাঁর বাড়িতে অতিথি হতে। নিরাপত্তার কারণে উত্তমকুমারের লেখকের বাড়ী কিংবা আনন্দবাজার অফিসে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সুবোধ ঘোষ মহানায়কের ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে এলেন। লেখক দোতলায় উঠতে পারবেন না। এক চেয়ারে বসিয়ে চারজন বাহকের সাহায্যে ওপরে তোলা হল। উত্তমকুমার এগিয়ে এসে 'চেয়ারের একটি হাতল ধরে বহন-ইঙ্গিতের সৌজন্য দেখালেন।' লেখকের চোখে মুখে তৃপ্তির অভিব্যক্তি।

> অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে দুজনের কথাবার্তা এগোল। এরপর স্বাভাবিকভাবেই উঠল আর্থিক লেনদেনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়টি। উত্তমকুমার বললেন – এবার দয়া করে বলুন গল্পদুটির জন্য আপনার প্রণামী কত দেব ? সুবোধ ঘোষ তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। ফীজ্ নয় প্রণামী। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে শব্দদুটোর ব্যবহার নিয়ে, ব্যবধান নিয়ে গুরুতর সমস্যা দেখা না দিলেও, স্পর্শকাতর সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের কাছে শব্দ দুটোর পার্থক্য তাঁকে বিপরীতধর্মী আচরণ করতে বাধ্য করেছিল। উত্তমকুমারকে সুবোধ ঘোষের উত্তর – 'যা আপনারা এই সব ক্ষেত্রে দিয়ে থাকেন, তাই দেবেন'। – চেক্ লিখে দিলেন মহানায়ক। কোন সমস্যা হয়নি।[৬৭]

সুবোধ ঘোষের মূল পরিচিতি একজন কথাসাহিত্যিক হিসেবে। তবে কথাসাহিত্যর পাশাপাশি একজন সাংবাদিক হিসেবও যে তিনি যথেষ্ট সফল ছিলেন, তা বিদগ্ধজন দ্বারা স্বীকৃত। আনন্দবাজারে সুবোধ ঘোষের সহকর্মী সাংবাদিক, গৌরকিশোর ঘোষ লিখেছেন —

> সুবোধদা আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে তিনটি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সম্পাদক লেখক, কলমনিষ্ট এবং প্রতিবেদক হিসেবে। ...সুবোধদার সাংবাদিকতার ভাষা, সাধু ও চলিত যেমন প্রাঞ্জল আবার তেমনই ব্যঞ্জনাময়।
>
> সুবোধদা ১৯৬৫ সালে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। সেই সময় হজরতবাল অর্থাৎ নবীর পবিত্র কেশ চুরি যাওয়ার ঘটনাকে উপলক্ষ করে কাশ্মীরে হিংসার তান্ডব বেধে গিয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এ হিংসার শিকার হয়েছিলেন। সুবোধদা আনন্দবাজার পত্রিকায় সে ঘটনার যে সব প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন, সেগুলো যেমন তথ্যবহুল তেমনই প্রাঞ্জল।
>
> একদম প্রথম পর্যায়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দাঙ্গা বিদ্ধস্ত নোয়াখালি অঞ্চল ঘুরে এসে বহু প্রতিবেদন লিখেছিলেন তিনি। যেমন লিখেছেন ১৯৬২র চীনা যুদ্ধের পর নেফা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। ভারতের 'মিলিটারী সায়েন্স' সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য্য পড়াশুনা ছিল –যার জন্য কাশ্মীর ও নেফা দুই যুদ্ধ এলাকা নিয়ে তাঁর ভিন্ন স্বাদের 'রিপোর্ট' বা 'ডেস্প্যাচ' এত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।
>
> সুবোধদাকে যদি বাংলা সাংবাদিকতার সব্যসাচী বলি, তাতে কোন অত্যুক্তি হবে না।[৬৮]

অগণিত পাঠকের অন্তরে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার আসন লাভ করে কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ সর্বোচ্চ এবং একজন সাহিত্যিকের একান্ত প্রার্থিত পুরস্কার লাভ করেছিলেন, সন্দেহ নেই। একইসঙ্গে অবাক বিস্ময়ে আমরা লক্ষ করি যে সাহিত্যিক হিসেবে সুবোধ ঘোষ কিন্তু প্রচলিত কোন সরকারী বা আধা-

সরকারী পুরস্কার লাভ করেন নি। আনুষ্ঠানিক অর্থে সুবোধ ঘোষ কিন্তু দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন। আনন্দ পুরস্কার এবং জাগত্তারিণী স্বর্ণপদক। বহু লেখকই সুবোধ ঘোষকে উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত না করার জন্য আক্ষেপ করেছেন। অশোককুমার সরকার এ বিষয়ে লিখেছেন —'সুবোধ ঘোষ এত বড় লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তেমন কোন স্বীকৃতি পাননি এটা দুঃখের এবং লজ্জার।'[৬৯]

সাত

সুবোধ ঘোষের মৃত্যু নয়-ই মার্চ ১৯৮০। পরদিন বিভিন্ন কাগজে পত্র-পত্রিকায় তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানো হয়, বিভিন্ন স্মরণ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় সুবোধ ঘোষের প্রয়াণে প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয়। সুবোধ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সঙ্গে, ঐ সম্পাদকীয়তে সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের প্রতি অবিচারের অভিযোগও করা হয়েছিল।

> অযান্ত্রিক একটি মানুষ চলিয়া গেলেন। জীবনের প্রতি রোমকূপে, হৃদপিন্ডের কোমলতম কন্দরে দেহান্তরালের শৈশ্মিক ঝিল্লির তারে তারে যিনি সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত উৎস খুঁজিয়া ফিরিতেন, ত্বকের বর্ণগরিমা অপেক্ষা রক্তের সঙ্গে রক্তের অনুরক্তি যে অনেক বড় – এই মহৎ বিশ্বাস যাঁহাকে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করিয়াছে, সেই পথিক ভালোমন্দের শেষ মাইলচিহ্নটি পিছনে ফেলিয়া লোকদৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলেন। বাংলা সাহিত্যের বর্ণাঢ্য ইতিহাসে কোন শিরোনাম তাঁহার প্রাপ্য, তাঁহার কর্ম ও কৃতি কোন্ নিক্তিতে মাপা হইবে – সে বিচারের ক্ষেত্র এবং কাল স্বতন্ত্র। কিন্তু সন্দেহ নাই যে, তিল তিল করিয়া আজীবন যে অঞ্জলি তিনি সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দিয়া গিয়াছেন কোন স্বীকৃত ভক্তের নিবেদনের চেয়ে তাহার মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। কম বেশী সব লেখকই আপন অভিজ্ঞতা ধনকে চিরকালের মত পাঠকবৃন্দের দরবারে অমলরত্নের শোভায় বিকীর্ণ করিয়া যাইতে চান।
>
> মহাকালের বিচার কোন একটি বসন্ত মুহূর্তে তো হয় না। তবে সুবোধ ঘোষ যাহা পারিয়াছিলেন তাহা নির্দ্বিধায় বহু স্রষ্টার ঈর্ষার বস্তু। কারণ, তাঁহার অভিজ্ঞতার ভান্ডার ছিল দূরবিস্তৃত, তাঁহার সঞ্চরণ বিদ্যার আশ্রিত পদক্ষেপ মাত্র। একদা বড় কঠিন দিন যাপনের সংগ্রাম তাঁহাকে যেমন করিতে হইয়াছে, তেমনই জীবনের পাঠশালায় সবচেয়ে বড় সত্যগুলি তিনি আয়ত্ব করিয়াছেন – কখনও প্রেমে, কখনও ভাগ্যের প্রশ্রয়ে কখনও বা অতিকঠোর আঘাতের মূর্তিতে। তাঁহার সাহিত্যচর্চার মধ্যে আকস্মিকতা ছিল না, যাহা ছিল তাহার নাম অনিবার্যতা – শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির যাহা পরম লক্ষণ। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে ভাবনা-কল্পনা ও অনুভবের মধ্যে জীবন বৈচিত্র্যের যে ছবি আগেই রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহারই প্রতিচ্ছবি একদিন গল্পরূপে বিমূর্ত হইতে পারিয়াছিল। আর, মূলতঃ প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক সুবোধ ঘোষ যে ক্রমে নূতন যুগধারার উপযোগী একটা মানসিক 'স্বী-করণের' ভূমি প্রস্তুত করিয়া লেখনী সঞ্চালন করিতে পারিয়াছিলেন, এই কৃতিত্বটি উপেক্ষনীয় নয়। এই সম্পাদকীয় স্তম্ভে দিনের পর দিন যে প্রত্নকর্ম ঘননিবন্ধ অথচ ধ্বনি মর্মরিত ভাষায় অতি অসংখ্য স্বাক্ষরহীন নিবন্ধ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অসংশয়ে সংবাদপত্র ও সাহিত্য উভয়েরই বিত্তবৃদ্ধি ঘটাইয়াছে।

তিনি কি পারিয়াছেন তাহা খোলা পাতার মত উত্তরপুরুষের সম্মুখে প্রসারিত রহিল। তিনি কি পাইয়া গেলেন ? না, সাহিত্য আকাডেমী বা রবীন্দ্র পুরস্কার কোনটাই যে তিনি পান নাই, এই লজ্জাকর কান্ডটা নিয়া আজ আক্ষেপ করিব না। যে প্রাপ্তি তাঁহাকে মহত্তর করিত না, বরং দাতাকেই ঐশ্বর্য্য আনিয়া দিত — কোন্ কৃপণতা কেমন করিয়া সেই দীনতাই প্রকট করিল, সে আলোচনা আজ থাক। লেখকের জীবনের সর্বোত্তম পুরস্কার পাঠকের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা যাহা তিনি তাঁহার প্রথম রচনা হইতে শুরু করিয়া জীবন সায়হ্ন পর্যন্ত পাইয়া গেলেন। 'ভারত প্রেমকথা'য় অলিখিত একটি অধ্যায় কোনও পুরুষ-রমণীর প্রেম নয়—এক দীপ্ত লেখকের সহিত তাঁহার অগণিত পাঠকবর্গের পারস্পরিক ভালবাসা।[৭০]

আট

সুবোধ ঘোষের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালের বার্ষিক আনন্দবাজার পত্রিকায়। তারপর থেকে তিনি দীর্ঘদিন গল্প এবং উপন্যাস লিখে এসেছেন। মাঝে মাঝে এই ধারায় অবশ্য একটু আধটু ছেদ পড়েছে। তবে সেই সাময়িক বিরতি কাটিয়ে আবার তিনি লেখায় মন দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি উল্লেখযোগ্য।

এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে একটানা অনেক বৎসর এবং অনেক মাস বাদ গিয়েছে, গল্প লেখার ইচ্ছা ও চেষ্টা দুইই স্তব্ধ হয়ে যেন সাময়িক বিরাম উপভোগ করেছে। একবার একটানা পুরো চার বছর এবং একবার একটানা পুরো দু-বছর একটিও গল্প লিখিনি।[৭১]

১৯৪০ থেকে ১৯৬৮ এই আটাশ বছরে সুবোধ ঘোষের লেখা ছোটগল্পের সংখ্যা ১৫৭। মোট পনেরটি গ্রন্থে এই গল্পগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। ফসিল — ১৯৪০, পরশুরামের কুঠার (১৯৪০), কুসুমেষু, ভোরের মালতী, যতুগৃহ (১৯৫০), থিরবিজুরী (১৯৫৫), অর্কিড, নিকষিত হেম, নিতসিঁদুর (১৯৫৮), দিগঙ্গনা, মনভ্রমরা (১৯৬০) এবং চিত্তচকোর, সায়ন্তনী, মনোবাসিতা এবং পলাশের নেশা (১৯৬৮)।

এ ছাড়াও সুবোধ ঘোষের বেশকিছু উচ্চপ্রশংসিত এবং ভিন্নধর্মী গল্প রয়েছে-'ভারত প্রেমকথা' কিংবদন্তীর দেশ, পুতুলের চিঠি-তে। পশু-প্রেম-প্রকৃতি বিষয়ক অদ্ভুত এবং একেবারেই নতুন ধরণের দশটি গল্প লিখেছেন তিনি। গল্পগুলি তাঁর মৃত্যুর পরে 'ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ প্রকাশিত 'ভরা থাক...সুবোধ ঘোষ স্মৃতি তর্পণ'-এ সুবোধ ঘোষের রচনাসম্ভারে ৩২ টি উপন্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে। তিলাঞ্জলি, গঙ্গোত্রী, একটি নমস্কারে, ত্রিযামা, সুজাতা, শুন বরনারী, বহুত মিনতি, শতভিষা, শ্রেয়সী, মুক্তিপ্রিয়া, নাগলতা, রূপসাগর, বর্ণালী, ভিতর দুয়ার, বাসরদত্তা, বন উপবন, এসো পথিক, ছায়াবৃতা, বসন্ত তিলক, পুনর্ণবা, সীমন্ত সরনি, সেই অদ্ভুত অভ্রখনি, শতকিয়া, কান্তিধারা, দুই গন্ধর্ব, বন্ধু গোলাপ, জল-কমল, নবীন শাখী, মীন পিয়াসী, ভিলা মাধবি, জিয়া ভরলি এবং কালকেতু।

সাহিত্যক্ষেত্র ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে সুবোধ ঘোষের অসাধারণ জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তি, উৎসাহ এবং অনুসন্ধিৎসা বেশকিছু ভিন্নধর্মী রচনার সৃষ্টি করেছিল। এই রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে অভ্যুদয়, ভবানী পাঠক ছদ্মনামে — আকাশমায়া, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, রঙ্গবল্লী, কালপুরুষের সাতপাঁচ, ভারতের আদিবাসী, কাগজের নৌকা, ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস, অমৃতপথযাত্রী এবং ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো।

'ভারত প্রেমকথায়'য় মহাভারতের কুড়িটি প্রেমোপাখ্যানকে সুবোধ ঘোষ পুনর্গঠন করে উপস্থাপিত করেছেন। নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবাণের মত অতিপরিচিত গল্পগুলির পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত মহাভারতের প্রেমোপাখ্যানগুলিও স্থান পেয়েছে 'ভারত-প্রেমকথায়'য়। এই গল্পসংগ্রহে সুবোধ ঘোষ মুন্সীয়ানার সঙ্গে দেখিয়েছেন সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উপযুক্ত ভাষা এবং দক্ষ পরিবেশনায় অতি পুরোনো, পৌরাণিক প্রেম কাহিনীও আধুনিক পাঠকের কাছে কত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

'কিংবদন্তীর দেশে' ত্রিশটি ঐতিহাসিক কিংবদন্তী গল্পাকারে বর্ণিত হয়েছে। কিংবদন্তীতে একটি অস্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপঠ যেমন থাকে তেমনি থাকে রহস্যনিবিড়তার আস্তরণ। ফলে কিংবদন্তীতে অতিরঞ্জন এবং অলৌকিকতার অনুপ্রবেশও অস্বাভাবিক নয়। এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সুবোধ ঘোষের কিংবদন্তীর ত্রিশটি গল্প যথার্থভাবেই রসোত্তীর্ণ। 'কিংবদন্তীর দেশে'র গল্পগুলি সম্পর্কে বিশেষত 'কিংবদন্তী' সম্পর্কে সুবোধ ঘোষের বক্তব্য —

> ...আজও দেখা যায় যে জংলী অঞ্চলের নিভৃতে অবস্থিত কোন ডিহির অথবা ক্ষুদ্রতম গন্ডগ্রামের সাধারণ নিরক্ষর মানুষও তার জীবনের চারদিকে কাহিনীময় এক পরিবেশ তৈরী করে রাখে।
>
> স্থানিক ঘটনা অথবা স্থানিক নদী, দিঘি অরণ্য পাহাড় ও জলকুন্ড অথবা একটি বটবৃক্ষ কিংবা একটি প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রকে আর শ্মশানভূমিকে প্রসঙ্গ ক'রে নিয়ে সে বহু কাহিনী সৃষ্টি করে। তার মন তার নিজেরই রচিত এই কিংবদন্তীর দেশে ঘুরে ফিরে তার বিস্ময় ও কৌতুহলের তৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই এই ধরণের এক একটি কিংবদন্তীর দেশ আছে। আমাদের বাংলাদেশেও আছে।[৭২]

'ভারতের আদিবাসী' গ্রন্থে সুবোধ ঘোষ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে আদিবাসী সমাজে 'সংগ্রাম' শুধুমাত্র কথার কথা নয়, আদিবাসী সমাজে সংগ্রামের আরেক নাম—জীবন। এই গ্রন্থে প্রাবন্ধিক সুবোধ ঘোষ এক গবেষকের অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে একেবারে আদিবাসীদের আঙিনায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এই গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ সাল। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিস্তৃত রচনাকালে সুবোধ ঘোষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রামের মূল সুরটি তুলে ধরেছেন। 'ভারতের আদিবাসী'কে তাই নিঃসন্দেহে সুবোধ ঘোষের এক গবেষণালব্ধ দলিল বলা চলে। 'ভারতের আদিবাসী' গ্রন্থটি সম্পর্কে উচ্ছসিত বিনয় মাহাতো বলেছেন —

> হাজারিবাগের জঙ্গল থেকে মহানগর কলকাতার আনন্দবাজার পর্যন্ত হাঁটা পথে তিনি যে মাটি ও মানুষকে দেখেছিলেন, তাদের প্রকৃত পরিচয়কে আরো নিবিড় করে জানার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এই 'ভারতের আদিবাসী'। এই গ্রন্থ ভারতের আদিবাসী সমাজের প্রতি বুদ্ধিজীবি বাঙালীর যে জিজ্ঞাসা জাগ্রত করেছিল, বর্তমান ভারতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় তার তাৎপর্য্য অনেক গভীর ও অর্থবাহী।
>
> ...আবেগের তাড়নায় নয়, যুক্তিসংগত ভাবেই মনে হয় – ইদানীং আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চার নামে যে জঞ্জাল জমে উঠেছে, হয়তো সেই আবর্জনা সরাতে আবার সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব হবে পরশুরামের কুঠার হাতে। আর তার সেই আবির্ভাবকে প্রথম শংখধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাবে 'ভারতের আদিবাসী'।[৭৩]

'কাগজের নৌকা' ভারতীয় কারুশিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সুবোধ ঘোষের একটি গ্রন্থ। সুবোধ ঘোষ শুধুমাত্র একজন কথাসাহিত্যিক ছিলেন না, শিল্প এবং কারুশিল্পের সঙ্গেও তার আত্মিক যোগ ছিল। 'কাগজের নৌকা'য় সুবোধ ঘোষ বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবি মানুষের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন শ্রমের মধ্যেই শিল্পীর সাধনা, পরিপূর্ণ কাজের মধ্যেই জীবনের আদর্শ এবং কাজের মধ্যেই রোমান্স। অন্যদিকে সুবোধ ঘোষ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে আধুনিক পুঁজিবাদের নিয়মে শ্রমিক শোষনেই শিল্পের প্রসার।

> মানুষের শ্রম হবে মধুকরের শ্রম—এই শ্রমের মধ্যে শিল্পীর সাধনা। গানের গুঞ্জন, কাব্য, বিজ্ঞানবিচিত্রতা, সামাজিক শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সাম্য—একই বিধানে মিশে আছে একটি পরিপূর্ণ-কাজের জীবনের আদর্শ। কাজের মধ্যেই গান, কাজের মধ্যেই শিল্পসৃষ্টি। কাজের মধ্যেই রোমান্স। ...মৌমাছি শুধু শিল্পী নয়, কেমিষ্টও। প্রত্যুষের আলোকের সাড়া জাগাবার মুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে দিন সমাপনের আবছা আঁধারের প্রথম মুহূর্ত পর্যন্ত এই শিল্পী-পতঙ্গ ফুলের মধু আহরণ করে বেড়ায়। কিন্তু ফুলের জীবন বিপন্ন হয় না। অথবা ফুলের বর্ণ ও সৌরভের কিছুমাত্র হানি হয় না। শিল্প সৃষ্টির নৈতিক বুনিয়াদ এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রয়েছে। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদের নিয়মে শ্রমিকের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করেই শিল্পসৃষ্টি হয়ে থাকে। সোসালিষ্ট বিচারেই বলুন, বা সবল মানবতা ধর্মী বিচারেই বলুন, শিল্পের এই নৈতিক ভিত্তিকে অটুট রাখাই সভ্যতার মর্যাদা।[৭৪]

'অভ্যুদয়' একটি গীতি-নৃত্যনাট্য। ১৯৪৫ এর ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় রঙমহল মঞ্চে পরিবেশিত হয়েছিল। এক তীব্র জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত অভ্যুদয়ের নাট্য পরিকল্পনাও ছিল মূলত সুবোধ ঘোষের। তবে এই গীতি-নৃত্যনাট্যের 'গীত' অংশে নিরূপমা দেবী এবং সজনীকান্ত দাসের বিশেষ অবদান ছিল। প্রস্তাবনার গান (হত-চেতনা ভারতবাসী...) এবং বিপ্লবের গান (ওদের আইন, ওদের থাক) সজনীকান্ত দাসের লেখা।

আকাশমায়া ১৯৪২ এ প্রকাশিত ছোটদের জন্য একটি ছোট্ট বই। বর্তমানে বইটি দুস্প্রাপ্য। সুবোধ ঘোষের বাড়ির নিজস্ব গ্রন্থাগারেও বইটি পাওয়া যায়নি। সুবোধ ঘোষের পুত্র উত্তম আকাশমায়া সম্পর্কে বলেছেন —

> সেই ছোট্ট চটি বইটির মজাদার কাহিনীটি আজো আমার মনকে নাড়া দেয়। ...মোম্বাসা, কিলিমানজারো – আফ্রিকার ভূগোলের জায়গাগুলোর নাম প্রকাশ পেয়েছিল এই বইএর নানা জায়গায়।[৭৫]

ছোটগল্প এবং উপন্যাস ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে সুবোধ ঘোষ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রতিটি বিষয়ের উপর তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি আমাদের বিস্মিত করে। আমরা আরো বিস্মিত হই যখন দেখি এই জ্ঞান তাপসই শিশু কল্পনায় রামধনু রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিয়ে লিখেছেন শিশু সাহিত্য। 'পুতুলের চিঠি' পড়ে সুবোধ ঘোষকে একজন প্রতিষ্ঠিত শিশু সাহিত্যিক আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হবে না।

পুতুলের চিঠিতে রয়েছে ছ'টি চিঠি এবং ছ'টি গল্প। প্রতিটি গল্পের শুরুতেই রয়েছে চিঠির প্রাথমিক কাঠামো। 'কাঁকুলিয়া, পয়লা বৈশাখ, স্নেহের পুতুল' আবার শেষ হ'ত 'ভালবাসা নিও। ইতি

মেজোকাকু'[৭৬] বলে। —এই পুতুল ছিলেন, সুবোধ ঘোষের দাদা সুধীর ঘোষের তৃতীয়া কন্যা। সুবোধ ঘোষের পারিবারিক কাহিনী থেকে জানা যায় যে এই পুতুলকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং ভালবাসতেন সুবোধ ঘোষ। পরে সম্ভবত নিদারুণ অভিমানে সুবোধ ঘোষ তাঁর এই অতিপ্রিয় ভাইঝির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করেন। কারণ পুতুল কাকাকে একেবারেই না জানিয়ে একটি ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করে ফেলায়, সুবোধ ঘোষের ঘটা করে ভাইঝির বিয়ে দেবার ইচ্ছেটা অধরাই থেকে যায়। সুবোধ ঘোষের পুত্র উত্তম ঘোষ বিষয়টিকে 'একটি পারিবারিক ট্রাজেডি''[৭৭] হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছেও বিষয়টি নি:সন্দেহে একটি ট্রাজেডি এই কারণে যে – পুতুলের চিঠিতে মজাদার গল্পের সংখ্যা মাত্র ছ'য়েই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

সুবোধ ঘোষের পান্ডিত্য যে কত বিস্তৃত ছিল, তার আর এক প্রমাণ 'কালপুরুষের সাতপাঁচ'। কালপুরুষ সুবোধ ঘোষেরই ছদ্মনাম। সুবোধ ঘোষ যখন আনন্দবাজারে কর্মরত ছিলেন, তখন ঐ পত্রিকায় কালপুরুষের সাতপাঁচ শিরোনামে একটি বিশেষ জনপ্রিয় এবং চিত্তাকর্ষক লেখা প্রকাশিত হ'ত। এই লেখায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অনায়াস বিচরণ করেছেন সুবোধ ঘোষ।

১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয় সুবোধ ঘোষের রঙ্গবল্লী। রঙ্গবল্লীতে ভারতের নিজস্ব শিল্প শৈলীর তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ রয়েছে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মধ্যে একদিকে যেমন তথ্য ও যুক্তির উপর নির্ভর করে ভারতীয়তার সংস্কৃতিময় অন্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে একজন কথা-সাহিত্যিক হিসেবে শিল্প সম্পর্কে বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও তুলে ধরেছেন, এই বিশেষ ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতির সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই।

যে কোনও সাহিত্যিককেই কমবেশি মনোবিশ্লেষণ করতে হয়। নইলে সৃষ্ট চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তার জন্য মনস্তত্ত্বের উপর গবেষণা বা অগাধ পান্ডিত্য কখনই আবশ্যিক নয়। সুবোধ ঘোষ বরাবরই এক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর সুদীর্ঘ আলোচনা করে তিনি লিখলেন 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড্' – ১৯৪৩ সালে।

শুধু মনস্তাত্ত্বিক নন, সুবোধ ঘোষ নিজেকে একজন যথার্থ ঐতিহাসিক বলে প্রমাণ করেছেন তাঁর 'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস' গ্রন্থে। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোরাপত্তনের প্রতিটি সোপানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমস্ত রোমাঞ্চকর কাহিনী, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্রমোন্নতির ধারা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে সেনাবাহিনীর সার্বিক ঐক্য এবং দৃঢ় প্রত্যয় যে কোনও পাঠককে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহে এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে, সুবোধ ঘোষের ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস, বাংলা ভাষায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক তথ্যনিষ্ঠ দলিল।

১৯৫৩ তে প্রকাশিত হয়, সুবোধ ঘোষের এক ভিন্নধর্মী রচনা 'হিমালয় অভিযান ও শেরপা তেনজিং। গ্রন্থটিতে একদিকে যেমন বহু মূল্যবান তথ্য সন্নিবেসিত হয়েছে, অন্যদিকে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর অপূর্ব শব্দ চয়নে এবং মনোজ্ঞ বর্ণনায়।

মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও বাণী নিয়ে সুবোধ ঘোষ রচনা করেছেন 'অমৃতপথযাত্রী'। সুবোধ ঘোষের রাজনৈতিক মতবাদ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থটি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই কিছু আলোচনা করেছি। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত অমৃতপথযাত্রীতে আমরা এক অন্য সুবোধ ঘোষের পরিচয় পাই। এই গ্রন্থে সুবোধ ঘোষ কেবলমাত্র ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গান্ধীজীকে দেখেন নি, তিনি গান্ধীর থেকেও গান্ধীবাদের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহাত্মার অহিংস নীতি শুধুমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে

এমনকি ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের ক্ষেত্রেও 'অহিংস নীতি' কত বেশি কার্যকরী তা তিনি যুক্তি ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা ভাষায় গান্ধী এবং গান্ধীবাদের উপর এমন বিশ্লেষণধর্মী প্রামাণ্য গ্রন্থ খুব বেশি নেই।

সুবোধ ঘোষের 'দিনলিপি' একটি সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ এবং জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত দশটি গল্পের সংকলন গ্রন্থ 'ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে।

সুবোধ ঘোষের রচনা সম্পর্কে আগ্রহী যে কোনও পাঠকের মনে এই কথাসাহিত্যিকের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে তাঁর সাহিত্যজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ধর্মবিশ্বাস এবং স্বেচ্ছাএকাকীত্ব সম্পর্কে। 'ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো'র স্মৃতিচারণ পর্ব—'সেদিনের আলোছায়া'য় লেখক সম্ভাব্য এমনই বহু প্রশ্নের উত্তর অথবা উত্তর সঙ্কেত দিয়েছেন।

ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তোর দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে 'দিনলিপি'। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় যখন যে বিষয় তাঁর মনকে নাড়া দিত, তখনই সুবোধ ঘোষ সেই ঘটনাটিকে মনে রাখবার সূত্র হিসেবে দু-একটি ছত্র লিখে রাখতেন। এ সব দিনলিপিকে ভিত্তি করেই অনেক সময় অনেক ভাল গল্প বেড়িয়ে এসেছে তাঁর কলম থেকে। কখনো কখনো সংবাদপত্র থেকেও স্পর্শকাতর কিছু ঘটনা দু-চার কথায় লিখে রেখেছেন তাঁর দিনলিপিতে। যেমন —

> জনৈক নিঃসন্তান গ্রামবাসীর পালিত পুত্র ছিল। পরে নিজের পুত্র হয়। নিজপুত্র জন্মাবধি রুগ্ন হয়। তান্ত্রিক সাধু পরামর্শ দেয়, পালিত পুত্রকে বলি দিলে নিজপুত্র সুস্থ হবে। নতুন কাপড় পরিয়ে পালিত পুত্রকে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। এই সময় জানাজানি হওয়ায় ধরা পড়ে যায়।[৭৮]

'ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো'র তৃতীয় পর্বে দশটি ছোটগল্প রয়েছে। তিনপাহাড়ীর বুড়ো বট, সিমারিয়ার বনমালা, একজন দ্বিতীয় জনমেজয়, মিঠুয়া জঙ্গলের সবই মিষ্টি, শ্রীমতী নিনা ভরদ্বাজ ও হরিনী, মধুগঞ্জের সুমতি, জগমোতির পাহাড়ী ময়না, জগনপুরের দীপালি রায়, ডায়েনা ও মালতী এবং হরেনবাবুর হরিণী মেয়ে। সুবোধ ঘোষের অন্যান্য গল্পের সঙ্গে এই গল্পগুলোর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। গল্পগুলো সুবোধ ঘোষের জীবনের শেষপর্বের রচনা এবং পশু ও প্রকৃতি প্রেম বিষয়ক।

এ পর্যন্ত, পুস্তকাকারে প্রকাশিত সুবোধ ঘোষের রচনা সম্ভারের একটি সাধারণ বিবরণ দেওয়া হ'ল। কিন্তু সুবোধ ঘোষের এমন অনেক রচনা আছে যা কখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, এবং সেই সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে। এ ধরনের লেখাগুলো সুবোধ ঘোষ লিখেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকায় একজন সাংবাদিক হিসেবে। সাংবাদিকতা সম্পর্কিত এই লেখাগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর সম্পাদকীয়। এ প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন স্বত্ত্বাধিকারী অশোককুমার সরকার বলেছেন —

> সুবোধবাবুর মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হ'ল, তা পূরণ হবে না। তিনি যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে সম্পাদকীয় লিখতেন, তা আর হবে না। অল্প সময়ের মধ্যে, কোন রেফারেন্স ছাড়াই তিনি যে সম্পাদকীয় লিখতেন, তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতাম। তাঁর ক্রিয়াপদ, বিশেষ্য এবং বিশেষণের ব্যবহার ছিল অনন্য।[৭৯]

১৯৮০ সালের নয়ই মার্চ মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে সন্ধ্যেবেলায় তাঁর শেষ রচনা, শেষ সম্পাদকীয় — ওমর খৈয়াম স্মরণে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের

জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া এবং গবেষক ও পাঠার্থীদের জন্য সুব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রসঙ্গত যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইরাণের কবি ওমর খৈয়ামের রচিত কয়েকটি 'রুবাই'-য়ের ভাবার্থক বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছিলেন, —আমি এখানে আপনাদের জন্য নিরালা পাতায়-ঘেরা কুঞ্জ ছায়ায় ঠাঁই রচনা করিয়া দিতে পারি। কিছু দ্রাক্ষারসের ব্যবস্থাও করিয়া দিতে পারি, কিন্তু যাহার সঙ্গে মন মিলাইয়া আপনারা মালা গাঁথিবেন, যাহার কন্ঠের সুর আপনাদের আনন্দের আবেশ প্রদান করিবে, সেই 'সাকী' তথা সঙ্গিনীকে আনিবার ও সঙ্গে রাখিবার দায়িত্ব আপনাদের নিজেদের। এক্ষেত্রে আমি কোন সাহায্য প্রদান করিতে পারিব না।

বলা বাহুল্য, শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালামের সেই প্রতিশ্রুতি গ্রন্থাগারের গবেষক ও পাঠার্থীদের জন্য ভাল পরিবেশ এবং ভাল ব্যবস্থা অনেক স্বাচ্ছন্দ নির্মাণের সহায়ক হইয়াছিল।

প্রসঙ্গত বলিতে হয়, ইরাণের দার্শনিক উপলব্ধির যে পরিচয় ওমর খৈয়ামের কাব্যে রম্য-প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহা মানবীয় প্রজ্ঞা এবং প্রেমের পরমার্থিক তত্ত্বের একটি আনন্দকর বিনিশ্চয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওমর খৈয়ামের কাছে প্রাকৃতিক রূপের বিস্ময়ও একটি তত্ত্বের রূপ প্রকট করিয়াছিল। এবং কোন সন্দেহ নাই যে, ওমর খৈয়ামের গোলাপখাসের শীতল ছায়া, বুলবুলদের বুলি এবং সাকীর পেয়ালার দ্রাক্ষারস ইত্যাদির সবই অতিন্দ্রিয়লোকের মহান অনুভূতির রূপক সমাহার। কাজেই ওমর খৈয়ামকে বুঝিতে হইলে জ্ঞানানুগ সাধনা থাকা চাই, উদার ও মহৎ মন চাই।

সংবাদ এই যে, কলিকাতার ইরাণ সোসাইটি ও কলিকাতার ভারতীয় মিউজিয়াম সম্মিলিতভাবে ওমর খৈয়ামের স্মরণ অনুষ্ঠান হিসাবে এক প্রদর্শনীর আহ্বান করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া কবির 'রুবাই' য়ের অনুলিপি পুস্তক এবং আরো বহুবিচিত্র নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে থাকিবে, যাহা সকল শ্রেণীর দর্শকের কৌতূহল চমৎকৃত করিবে বলিয়া মনে করা যায়। নয়শত বৎসর আগের ওমর খৈয়াম আজিকার সাংস্কৃতিক গবেষকের পক্ষে প্রতিভা ও কৃতিত্বের এক মহান বিস্ময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বর্তমান ইরাণের দিনগুলিও ওমর খৈয়ামের স্মৃতির মধ্যে এক সান্ত্বনার সন্ধান পাইবে।

ফিটজারাল্ড যিনি ওমর খৈয়ামের 'রুবাই' গুলির প্রথম ইংরাজি অনুবাদ করিয়া স্বয়ং বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কাউয়েল সাহেবের সাহায্যে এই কৃতিত্ব প্রদর্শিত করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন — এহেন ধারণা সকল সমালোচকের সমর্থন না-ও পাইতে পারে। ইরাণ সোসাইটি খোঁজ করিলে ওমর খৈয়ামের (ফিটজারাল্ড-কৃত এবং অন্যান্য আধুনিক সংস্করণের) দুর্লভ গ্রন্থের সাক্ষাৎ পাইতে পারিতেন — যাহার সাহায্যে প্রদর্শনী অন্য একটি শিক্ষার পরিবেশ হইতে পারিত। ওমর খৈয়ামের কাব্যের অজস্র সুচিত্রিত সংস্করণ — বস্তুত: আধুনিক কালের একটি বিশিষ্ট চিত্রকলার অনুশীলন জাগ্রত করিয়াছে।

জাতীয় গ্রন্থাগারে স্যার আশুতোষ প্রদত্ত পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে বিভিন্ন মূল্যবান ওমর খৈয়াম অনুবাদের দুর্লভ গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলি যেন চিত্রকলারীতির এক একটি অভিনব আধার। ওমর খৈয়ামের কাব্যিক

বৈচিত্র্যের অনুগত এক একটি সাংস্কৃতিক সৃষ্টির চমৎকার নিদর্শন।[৮০]

সুবোধ ঘোষের বেশ কয়টি গল্প এবং উপন্যাস বাংলা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রের অনেক প্রতিষ্ঠিত পরিচালক সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে ছায়াছবি পরিচালনা করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক, তরুণ মজুমদার, পীযুষ বসু, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং অন্য অনেকে। ছায়াছবিতে রূপায়িত কাহিনীগুলো হ'ল – ফসিল (ছায়াছবির নাম অঞ্জনগড়), জতুগৃহ, অযান্ত্রিক, ঠগিনী, ত্রিযামা, শুন বরনারী, বর্ণালী, শ্রেয়সী, শেষ প্রহর, সুজাতা, বারবধু, নাগলতা (ছায়াছবির নাম শিউলিবাড়ি) এবং পরশুরামের কুঠার। জতুগৃহ গল্প নিয়ে তৈরী হয়েছে হিন্দী ছবি 'ইজাজৎ'। শ্রেয়সী গল্প নিয়ে হয়েছে হিন্দী ছবি 'এক হি রাস্তা', চিত্তচকোর নিয়ে হয়েছে 'চিত্ চোর', গোত্রান্তর নিয়ে 'এক আধুরি কহানী, এবং গল্পের নাম অপরিবর্তিত রেখে অন্য একটি হিন্দী ছবি 'সুজাতা'।

নির্দেশিকা

১।	Naresh Chandra	—	New Criticism	পৃ:	১৬
২।	Rene Wellek & Austin Warren	—	Theory of Literature	পৃ:	৭৫
৩।	– Do –			পৃ:	৭৭
৪।	– Do –			পৃ:	৭৭
৫।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	উৎসর্গ	পৃ:	
৬।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	উৎসর্গ	পৃ:	
৭।	সুবোধ ঘোষ	—	ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সেদিনের আলোছায়া)	পৃ:	১৪
৮।	তদেব	—		পৃ:	১
৯।	তদেব	—		পৃ:	১৫
১০।	তদেব	—		পৃ:	
১১।	তদেব	—		পৃ:	৮৪
১২।	উত্তম ঘোষ	—	সুবোধ ঘোষ, বড় বিস্ময় জাগে	পৃ:	৮৩
১৩।	সুবোধ ঘোষ	—	ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সেদিনের আলোছায়া)	পৃ:	২১
১৪।	মুকুলরাণী ঘোষ	—	ভরা থাক (স্মৃতির সৌরভ)	পৃ:	৮৪
১৫।	উত্তম ঘোষ	—	সুবোধ ঘোষ, বড় বিস্ময় জাগে	পৃ:	৮৮
১৬।	তদেব	—		পৃ:	৮৮
১৭।	সুবোধ ঘোষ	—	ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সেদিনের আলোছায়া)	পৃ:	১৮-১৯
১৮।	উত্তম ঘোষ	—	সুবোধ ঘোষ, বড় বিস্ময় জাগে	পৃ:	৯২
১৯।	মুকুলরাণী ঘোষ	—	ভরা থাক (স্মৃতির সৌরভে)	পৃ:	৮৩
২০।	উত্তম ঘোষ	—	সুবোধ ঘোষ, বড় বিস্ময় জাগে	পৃ:	৯৩
২১।	সুবোধ ঘোষ	—	ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সেদিনের আলোছায়া)	পৃ:	১৫
২২।	তদেব	—		পৃ:	১৫-১৬
২৩।	তদেব	—		পৃ:	১৯
২৪।	তদেব	—		পৃ:	১৯-২০
২৫।	তদেব	—		পৃ:	২০
২৬।	তদেব	—		পৃ:	২০-২১
২৭।	তদেব	—		পৃ:	২১
২৮।	তদেব	—		পৃ:	২১
২৯।	তদেব	—		পৃ:	২১
৩০।	তদেব	—		পৃ:	২১-২২
৩১।	তদেব	—		পৃ:	১১
৩২।	তদেব	—		পৃ:	১২
৩৩।	তদেব	—		পৃ:	১১-১২
৩৪।	তদেব	—		পৃ:	১৩
৩৫।	তদেব	—		পৃ:	১৩-১৪
৩৬।	তদেব	—		পৃ:	১৪
৩৭।	তদেব	—		পৃ:	৯৭
৩৮।	তদেব	—		পৃ:	৯৭

৩৯। সুবোধ ঘোষ	—	ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সেদিনের আলোছায়া)	পৃ:	৯৭-৯৮
৪০। তদেব	—		পৃ:	৯৮
৪১। তদেব	—		পৃ:	৯৭
৪২। উত্তম ঘোষ	—	সুবোধ ঘোষ, বড় বিস্ময় জাগে	পৃ:	৯৮
৪৩। তদেব	—		পৃ:	৯৮
৪৪। তদেব	—		পৃ:	৯৮
৪৫। মুকুলরাণী ঘোষ	—	ভরা থাক (স্মৃতির সৌরভ)	পৃ:	৮৪
৪৬। অমিতাভ চৌধুরী	—	ভরা থাক (সুবোধ ঘোষ, শ্রীচরণেষু)	পৃ:	৪
৪৭। বিমল মিত্র	—	ভরা থাক (বিকল্প নেই)	পৃ:	৭০
৪৮। সুবোধ ঘোষ	—	ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সেদিনের আলোছায়া)	পৃ:	১৮
৪৯। তদেব	—		পৃ:	১৮
৫০। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	—	ভরা থাক (সুবোধ ঘোষ, সুবোধদা)	পৃ:	৫৪
৫১। তদেব	—		পৃ:	৫৪
৫২। তদেব	—		পৃ:	৫৪-৫৫
৫৩। সুবোধ ঘোষ	—	ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সেদিনের আলোছায়া)	পৃ:	১২
৫৪। উত্তম ঘোষ	—	সুবোধ ঘোষ, বড় বিস্ময় জাগে	পৃ:	৮৭
৫৫। দীপেন্দু চক্রবর্ত্তী	—	ভরা থাক (সুবোধ ঘোষের কুঠার)	পৃ:	৫০
৫৬। সুধী প্রধান	—	ভরা থাক (ফসিল থেকে তিলাঞ্জলি)	পৃ:	১০৮
৫৭। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	—	ভরা থাক (জাতীয়তাবাদী লেখক)	পৃ:	৬২-৬৩
৫৮। সুবোধ ঘোষ	—	অমৃতপথযাত্রী	পৃ:	১৩৩
৫৯। তদেব	—		পৃ:	১৩০
৬০। সুবোধ ঘোষ	—	ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সেদিনের আলোছায়া)	পৃ:	২৩
৬১। সুবোধ ঘোষ	—	ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সদিনের আলোছায়া)	পৃ:	২৩
৬২। তদেব	—		পৃ:	২৩-২৪
৬৩। বাদল বসু	—	ভরা থাক (বই পাড়ায় দেখিনি)	পৃ:	৬৪-৬৫
৬৪। তদেব	—		পৃ:	৬৫
৬৫। তদেব	—		পৃ:	৬৫
৬৬। উত্তম ঘোষ	—	সুবোধ ঘোষ, বড় বিস্ময় জাগে	পৃ:	১০৩-১০৪
৬৭। তদেব	—		পৃ:	১০৪
৬৮। গৌরকিশোর ঘোষ	—	ভরা থাক (সব্যসাচী সাংবাদিক)	পৃ:	৩৭ ও ৩৯
৬৯। অশোককুমার সরকার	—	ভরা থাক (অনন্য সম্পাদকীয়)	পৃ:	১২
৭০। সম্পাদকীয়	—	আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০।৩।১৯৮০		
৭১। সুবোধ ঘোষ	—	ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সেদিনের আলোছায়া)	পৃ:	১৭
৭২। সুবোধ ঘোষ	—	কিংবদন্তীর দেশে (ভূমিকা)	পৃ:	১৩
৭৩। বিনয় মাহাতো	—	ভরা থাক (ভারতের আদিবাসী)	পৃ:	৬৬-৬৭
৭৪। সুনীল পাল	—	ভরা থাক (কাগজের নৌকা ও শিল্পকথা)	পৃ:	১১০
৭৫। উত্তম ঘোষ	—	সুবোধ ঘোষ, বড় বিস্ময় জাগে	পৃ:	৯০
৭৬। তদেব	—		পৃ:	৯০
৭৭। তদেব	—		পৃ:	৯০
৭৮। সুবোধ ঘোষ	—	ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (দিনলিপি)	পৃ:	৩২
৭৯। অশোককুমার সরকার	—	ভরা থাক	পৃ:	১২
৮০। সুবোধ ঘোষ	—	ভরা থাক	পৃ:	১২৭